বিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা

১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০২০-২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা

সম্পাদক: মোঃ শরীফ হাছান, পরিচালক

সহযোগী সম্পাদক : এ. এম. শাহরিয়র আলম, সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, বিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০২০-২০২১
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 20th Year Issue 1427/2020-2021

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/জুন ২০২২

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০

টেলিফোন : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ২০৮০-৮৫, ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০১০-১৬

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০২৯

ওয়েব সাইট : www.bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : **১৬০.০০ টাকা মাত্র**

মূদ্রণে : **এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই**
৪৮/এবি, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

সামাজিক উন্নয়নে এলিটদের ভূমিকা: একটি সমীক্ষা..... ০১

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান এবং ড. মো: হাবিবুল্লাহ

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি ৩৫

তানযিনা আক্তার

সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া' মতবাদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা ৫১

নিরূপা ভৌমিক এবং ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম

জাপানের নতুন শ্রম অভিবাসন নীতিঃ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ..৬৭

মোঃ সাইফুল্লাহ আকন, শিবলী নোমান এবং আফনান নূর ভূঁইয়া

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলিটদের অবস্থা ৮৯

ড. মো: হাবিবুল্লাহ

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা ১২৩

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং তানযিনা আক্তার

সামাজিক উন্নয়নে এলিটদের ভূমিকা: একটি সমীক্ষা

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান[১] এবং ড. মো: হাবিবুল্লাহ[২]

Abstract

The Role of Rural Elites has been studied in differet times in South Asia and in Bangladesh. The earlier studies show the areas of performance of Elites in maintaining the law and order situation of rural areas.The present study finds some significant evolutions and developments in the areas of performance of rural Elites. Now a days the rural Elites perform in various diversified social concerns of rural lifes including adoption of modern education and medicare against the only law and order concern of earlier times. Because of the progressive adoption of thoughts and actions of the rural Elites the whole rural Bangladesh is proceeding towards a prosperous future under the formal and informal leadership of those rural Elites. This paper would help the readers to realize the changing of rural Elites of Bangladesh in the social development of Bangladesh.

ভূমিকা

উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হলো উন্নয়নের প্রতি মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ এলিটেরা ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্বে তাদের অধিষ্ঠান সে কারণেই। ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা, প্রভাব এবং নেতৃত্বের অবস্থান এবং বিকাশ স্পষ্ট হয়। ভূমিকার বহুমুখিতা এলিটের দক্ষতার পরিচায়ক এবং তাদের অব্যাহত মর্যাদার জন্য জরুরী। সমাজঘনিষ্ঠ জীবন যাপনে অভ্যস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আনুগত্য আদায়ে এবং মর্যাদার অবস্থানের সুরক্ষার জন্য এলিটদের সামাজিক ভূমিকা পালনে অগ্রাধিকার উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক প্রবণতা। সুতরাং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নে যেমন তারা ভূমিকা পালন করেন, তেমনি সমাজের ঐক্য-সংহতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ তারা গ্রহণ করে থাকেন। গ্রামীণ সমাজের নানা সমস্যা এবং অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপও তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক ব্যাধিস্বরূপ এই সমস্যাগুলো যেমন যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি গ্রামীণ সমাজের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের জন্য সুষ্ঠু সংস্কৃতির চর্চা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করার বিকল্প নেই। গ্রামীণ

১ সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২ সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ।

এলিটেরা এসব ভূমিকা শুধু পালনই করেন না বরং কখনো কখনো নিজেদের অপরিহার্যতা প্রমাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। ইতিবাচক উন্নয়ন প্রতিযোগিতার এই সাম্প্রতিক প্রবণতা নিঃসন্দেহে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিটদের সনাতনী ভূমিকার কার্যকারিতা এবং বর্তমানে সে ভূমিকার ব্যাপকতা পরিমাপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সে ভূমিকায় সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য।

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে:

এক. গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নের স্বরূপ উন্মোচন;

দুই. গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে এলিটদের অংশগ্রহণ (participation), ভূমিকা (role) পরীক্ষা; এবং

তিন. এ বিষয়ে ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য গবেষণার উপাদান সরবরাহ।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং আবদ্ধ ও খোলা প্রশ্নের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিট শ্রেণির ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণকেও এ গবেষণার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর তথ্যপ্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের ওপর পরিচালিত হয়েছে। বিশালপুর ইউনিয়নের মোট আয়তন ৫৪.৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫৩টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ২৯৬২১ জন; এরমধ্যে পুরুষ ১৫৪০৫জন এবং মহিলা ১৪২১৬ জন। শিক্ষার হার ৪২%। নির্বাচিত আরেকটি ইউনিয়ন মির্জাপুরের মোট আয়তন ১৫.৫ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ৫০৭২৩ জন ; এরমধ্যে পুরুষ ২৫৪০৪জন এবং নারী ২৫৩০৯ জন। শিক্ষার হার ৬২% (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯)।

এলিট ও গ্রামীণ এলিট:

সপ্তদশ শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষকে বিশেষিত করবার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ঊর্ধ্বস্থ কোনো সামাজিক দলকে বোঝানোর জন্য এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে (Bottomore, 1964)। কোনো সম্প্রদায়ের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো দলকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন (Pareto, 1935)। প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন যারা সরকারের ওপর শক্ত প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক এলিট এ বিশেষ দলের লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore এর মতে, এলিটীয় দর্শন মার্কসীয় দর্শনের একটি বিপরীত অবস্থা (Bottomore, 1964)। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। Mills তাদেরকে এলিট শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন এবং সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন (Mills, 1956:13)। তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে দেখান, 'ক্ষমতা এলিট' (Power Elite) সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। ঐ ক্ষমতা এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে কোনো কোনো তাত্ত্বিক সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, ব্যবসা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারীরা সমাজে একটি বিশেষ এলিট শ্রেণির সৃষ্টি করে। এলিট তত্ত্ববিদ Dahl ক্ষমতা এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা সমাজের উঁচু শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণির লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন (Dahl, 1963)। এলিট তত্ত্বের আরেকদল বিজ্ঞানী এলিটতত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন-যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি (Cole, 1956; Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965)। Lasswell এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন (Lasswell, 1952)। প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole এলিট বলতে সে দলকে বোঝান যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত কওে (Cole, 1956)। Kornhauser এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন (Kornhauser, 1965)। একই দলভুক্ত বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ' এলিট তারাই যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন' (Giddens,1973:3-4)।

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক Gunter Endruweit (1984) তাঁর Elites as agents of economic development শীর্ষক প্রবন্ধে এলিট ও উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্বাদি পর্যালোচনা করেন। ঐতিহ্যবাদী

ও আধুনিকতাবাদী এলিট, এলিটের বিবর্তন, সফল ও ব্যর্থ উন্নয়নের নির্ধারক প্রভৃতির সর্বশেষ তত্ত্বের পর্যালোচনা করে Gunter Endruweit লিখেন, 'সাধারণভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও নির্দিষ্টভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এলিটের সক্রিয়তা বিষয়ে একটি কার্যকর তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয় অনেকগুলো উপাদান-উপকরণ আমাদের হাতে আছে। সেগুলো নিঃসন্দেহে দেখিয়েছে, তত্ত্বটি এখনো অসম্পূর্ণ' (Gunter Endruweit, 1984: 32-38)।

এলিট ও উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্বের এই অসম্পূর্ণতা মেনেই এই গবেষণা এগিয়েছে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয়। গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg,1959)। বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে এ দু'ধরনের পদ্ধতি অবিমিশ্র নয় বরং পদ্ধতিগত সংমিশ্রণে কখনো কখনো ভিন্নমাত্রিক নেতৃত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। এর বাইরে ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলও গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণে প্রয়োগ করা হয়।

১) অবস্থানিক (Positional)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২জন।

২) যশস্বী (Reputational)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণির লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (Floyd Hunter, 1953)। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচাইতে বেশি মূল্য এবং সম্মান পাবেন তারাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে (Karim, 1990) এবং Harjinder Singh তাঁর পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন (Harjinder Singh, 1976)। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন। ১০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে যশস্বী এবং অবস্থানিক উভয় এলিটীয় যোগ্যতার বিদ্যমানতা একই সাথে লক্ষ্য করা গেছে।

৩) ইস্যু পারটিসিপেশন (Issue Participation)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

এলিট নির্ণায়ক উপাদান

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের

মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নেতৃত্বের জন্য জমির মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়। এর সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শিক্ষা, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং গ্রামীণ বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার যোগ্যতার সমন্বয় ঘটলেই নেতৃত্বের অবস্থান পাওয়া যায় এবং এলিটীয় মর্যাদা অর্জিত হয়। সুতরাং যারা উচ্চ বংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

ভূমিকা (Role)

এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপ্ড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ভূমিকা একটি প্রদত্ত 'সামাজিক অবস্থান' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এ সামাজিক অবস্থান এক গুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে, 'ভূমিকা'কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

'সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শঃ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতীতই 'ভূমিকা'কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে' (Neiman & Hugher, 1951: 141-49)। 'ভূমিকা'-র দুটি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজের একক হিসেবে 'ভূমিকা'[৭] এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে 'ভূমিকা পালন'। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয় ধারণার উন্নয়ন ঘটান G.H. Mead (Linton, 1936 Ges G.H. Mead, 1934).

T.R. Sarbin-এর মতে 'ভূমিকা' হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা (Lindzey, 1954:223-58)।

জনগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

একান্ত জরুরী (বেগম, ২০০৩:৬৪)। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কৌশল অতি সম্প্রতি উন্নয়ন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে (আলম, ২০০৬: ২০৫-২১৭)। আর এই জন অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রচেষ্টার নেতৃত্বে থাকেন গ্রামীণ এলিট শ্রেণি। গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিট শ্রেণি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার অসংহতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো এর সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ঝাটি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অনেক ক্ষেত্রে এসব দ্বন্দ্ব-কলহের শ্রেণি চরিত্র বিদ্যমান, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক অসংহতি, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থ রক্ষার প্রবণতা-এসব বিবাদের কারণ। একটি সমাজের একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোও রয়েছে। এ সাংগঠনিক কাঠামোর নেতাদের বলা হয় মাতব্বর {জানসেন (বাংলায়), ১৯৯০:৯৮}। যাদেরকে এখানে বলা হবে গ্রামীণ এলিট। গ্রামীণ এসব এলিটই গ্রামীণ ঝগড়া-ঝাটি এবং অসদাচরণের ক্ষেত্রে বিচার করে থাকেন (বিশ্বাস, ২০০২:৮০)। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের সংহতি, ঐক্য তথা সার্বিক উন্নতির জন্য কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিটই এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে তৎপরতা প্রদর্শন করেন (Rumi, 1985:128)। পারিবারিক বিবাদ, জমি নিয়ে (মালিকানা, সীমানা প্রভৃতি) বিবাদ, ধার-কর্য নিয়ে বিবাদ, বস্তুগত সম্পদ নিয়ে বিবাদ, মালিক-শ্রমিক বিবাদ, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব নিয়ে কলহ-বিবাদ গবেষণা এলাকার গ্রামীণ ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ এসব বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। বিবাদ মীমাংসার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালিশ (সালিশী অর্থে)। সালিশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এর বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে বিবাদ-মীমাংসা হয়ে আসছে তার নাম সালিশ। পরিবারের বা একটি গৃহস্থালীর মাঝে যে সকল বিবাদের উদ্ভব হয় তার মীমাংসা করেন পরিবার প্রধান। একই বাড়ির দু'পরিবারের বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব বাড়ি প্রধানের। বিবাদ বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গেলে ক্রমান্বয়ে পাড়া প্রধান, গ্রাম প্রধান বা গ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের এখতিয়ারে চলে যায় (ইসলাম, ২০০৩:১৮৯)। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় গ্রাম্য সালিশ মীমাংসা বা সালিশ। গ্রাম্য শান্তি-শৃঙ্খলা এবং বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসায় সালিশের ভূমিকা অতুলনীয় এবং মানসিক, আর্থ-সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে গ্রামীণ সালিশের গুরুত্বও অপরিসীম (শহিদুল্লাহ,১৯৯২:১৬২)। এসব বিবাদ সালিশে নিস্পত্তি করা না গেলে গ্রামীণ সংহতি যেমন বিনষ্ট হতো, তেমনি বিবাদ নিস্পত্তিতে গ্রামবাসীদের আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে হতো। এতে গ্রামবাসীদের ভোগান্তির পাশাপাশি প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতো। সুতরাং সালিশের আর্থিক গুরুত্ব সীমাহীন।

সারণি - ১.১: গ্রামীণ এলিটদের সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন	১৪৫ জন	৭২.৫%
সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন না	৪৭ জন	২৩.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৮ জন	৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি ১.১ অনুযায়ী গ্রাম্য ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ১৪৫ জন (৭২.৫%) গ্রামীণ এলিট সালিশীতে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সচেতন এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা সমাজের সংহতি রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক মূল্যবোধ, গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা তাদের কাছে সর্বোচ্চ প্রাধান্যের বিষয়। সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা যায়। সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণকারী এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, মাতব্বর, প্রামাণিক, শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের সদস্যরা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকার তুলনায় গ্রামীণ এলিটেরা সালিশী ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। এতে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় গ্রামীণ সমাজের সংহতি ও কল্যাণে অবদান রাখা যায়। গ্রামীণ সাধারণ মানুষও সালিশ মীমাংসায় ভূমিকার ভিত্তিতেই এলিটদের মর্যাদা ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করেন। নিজেদের মর্যাদা, প্রভাব এবং ক্ষমতা চর্চার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এ সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণকে এলিটেরা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। বিবাদ নিস্পত্তির অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার তুলনায় সালিশ প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। কারণ গ্রামীণ সালিশ মীমাংসায় বাদী-বিবাদীর কোনো অর্থ ব্যয় হয় না, সাক্ষীরও অভাব হয় না (শহিদুল্লাহ্, ১৯৯২:১৬৮)। সর্বোপরি সালিশ বৈঠকের রায় দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। তাছাড়া কোর্ট-কাচারী ব্যয়বহুল ও দুর্নীতিযুক্ত। সেখানে ন্যায্য বিচার পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোর্ট-কাচারীতে ফাইল এদিক-ওদিক করতে গেলেই টাকার দরকার। থানা-পুলিশও ঘুষ ছাড়া কাজ করতে চায় না। আর তাই কোর্ট-কাচারী এবং থানা-পুলিশের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার । এছাড়া কোর্টে অথবা থানায় সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচারের ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু গ্রামীণ সালিশ বৈঠকে এ বিষয়গুলো (মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষের লেন-দেন ইত্যাদি) যথেষ্ট সহজ নয়। কারণ সালিশী বৈঠকে মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্রুত প্রতিবাদ হয় এবং প্রমাণিত হলে সাক্ষীকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাই আজও গ্রামীণ ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ সালিশই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর আশ্রয়স্থল হিসেবে

বিবেচিত হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ, ভাইয়ে-বোনে বিবাদ, পড়শী-পড়শী বিবাদ, গোষ্ঠীগত বিবাদ, অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিবাদ অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের সব রকম বিশৃঙ্খলার মীমাংসা হয় গ্রামীণ সালিশে (Rumi, 1985;129)। তাই গ্রামীণ এলিটেরা এ ধরনের সালিশী বৈঠকে অংশগ্রহণকে তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য এবং গ্রামীণ সমাজের ঐক্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। অবশ্য আতিউর রহমানের (১৯৯১) মতে, পুরোনো ক্ষমতাবানদের আদি প্রতিষ্ঠান সালিশের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়লেও নব্য ক্ষমতাবানদের আচরণ, সম্পদ আহরণ ও নিপীড়নকে সম্মানীয় ও সহনীয় করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা এখনো মোটেই গৌণ নয়। আপাত নিরপেক্ষতার ভান করলেও 'সমাজ' সালিশ আসলে শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার। মাতব্বরদের অবস্থানও সে প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে (রহমান, ১৯৯১:১১৫)। এ পর্যবেক্ষণটিতে ঐ ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক গুরুত্বকে পর্যাপ্ত মাত্রায় বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে দাবি করার সুযোগ আছে। ক্ষেত্র বিশেষে ঐ ধরনের প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও গ্রামীণ সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এর বিকল্প কিছুও গড়ে ওঠেনি। সমাজ নামক সংগঠনটির ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যেই সালিশের মাধ্যমে কোনো আরোপিত শাস্তি না দিয়ে ঝগড়া-বিবাদের একটি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করা হয় যার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকারি আদালতের চেয়ে গ্রাম্য আদালতে বেশি বিবেচনা করা হয় (বিশ্বাস, ২০০২:৯৯)। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করেন না। তবে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের বেশিরভাগই সালিশী মীমাংসার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে অথবা পরিবার প্রধান না হওয়ায় অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সালিশে অংশ নিতে পারেন না। ব্যবসায়ী ও শিক্ষক গ্রামীণ এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সালিশী মীমাংসার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। অবশিষ্ট ৮ জন (৪%) গ্রামীণ এলিট গ্রামীণ সালিশে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোনো মতামত দেননি। তাদের কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করতে চাননি। অনেকে গ্রামীণ সালিশেও ঘুষ-দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিধায় অনাস্থা হিসেবে সালিশে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন বলে জানিয়েছেন।

সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসায় ঘুষ, দুর্নীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাতে এ ধরনের সালিশের রায়ের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ঐক্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই গ্রামীণ এলিটেরা বিচারিক প্রক্রিয়ার এ সনাতন পদ্ধতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকেন। পক্ষপাতদুষ্ট রায় যে গ্রামীণ সংহতিকে মাঝে মধ্যে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয় না তা-ও অস্বীকার করা যায় না। বাদী-বিবাদীর অনাস্থায় সালিশ কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদে ন্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক আইনী লড়াইয়ের জন্য আদালতে মামলা-মোকদ্দমাও

করে থাকেন। এই উভয় ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা লক্ষণীয়। আইনী প্রক্রিয়া এবং আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে গ্রামীণ এলিটদের দ্বারস্থ হতে হয়। শিক্ষিত এবং শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ থাকায় এসব ব্যাপারে তারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বিচার প্রক্রিয়া যেটাই হোক না কেন, গ্রামীণ বিবাদ মীমাংসায় গ্রামীণ এলিটদের তাৎপর্যপূর্ণ বিচারিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ঘুষ-দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে গবেষণা এলাকায় সালিশীর রায় নিয়ে উত্থাপিত নানা প্রশ্নে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ এ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সালিশী মীমাংসায় আস্থা কমছে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের গ্রামীণ সমাজ নামক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে বিভাজনের রাজনীতি অনেকটা দায়ী বলে ধারণা করা হয়।

শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

সব উন্নতির মূল হচ্ছে শিক্ষা। এর ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য উন্নয়ন কাঠামোর স্তর গড়ে ওঠে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ১৭ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সে লক্ষ্য রূপায়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমেই সাধারণতঃ তেমন অঙ্গীকারবদ্ধ জনশক্তি গঠনের চেষ্টা করা হয়। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ সমাজে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সমতা আনয়ন করার নৈতিক মনোবল পোষণ করবেন সেটিই সবাই আশা করেন। বাংলাদেশ সরকারও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক খাতটিকে যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে বটে; কিন্তু বেশির ভাগই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন গ্রামের জনসাধারণের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এ ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন পুরোপুরি গ্রামীণ এলিট শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল। অবকাঠামোর জন্য ইঁট, বালি, সিমেন্ট, বাঁশ, টিন, চেয়ার, বেঞ্চ এমনকি প্রতিষ্ঠানের জমি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদিও তাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে গ্রামীণ মক্তব, কওমী মাদ্রাসা, মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীণ এসব এলিটের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। তবে এসব সহযোগিতাকে তারা প্রভাব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার মনে না করে বাহ্যত পরকালীন শান্তির পুঁজি মনে করেন। তবে এটা ঠিক স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে এ ধরনের সহযোগিতা বেশ কার্যকর। ধর্মীয় এসব শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখতে পারে। গবেষণা

এলাকার প্রত্যেকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন গ্রামীণ এলিটেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিতে উদ্বুদ্ধকরণে, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণে, শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপে স্থানীয় এসব এলিটের নানামাত্রিক ভূমিকা লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের অবস্থান যাচাই করা হবে:

সারণি - ১.২: স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন	১৫৬ জন	৭৮%
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন না	৩৭ জন	১৮.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৭ জন	৩.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.২) অনুযায়ী ১৫৬ জন (৭৮%) গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত এবং সচেতন। ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক, কলেজের প্রভাষক, ঐতিহ্যিক এলিট এবং আনুষ্ঠানিক এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। শিক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব বেশ ইতিবাচক। তাদের মতে, শিক্ষা ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উত্তরদাতা এ শ্রেণির এলিটেরা কম-বেশি আন্তরিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হন। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে ভূমিকার প্রসারতার ব্যাপ্তী হ্রাস পাচ্ছে মনে করা হয়। শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা রাখার আকাঙ্খা ব্যাপক কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই যৎসামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী তারা শিক্ষার জন্য ভূমিকা নয় বরং কিছু একটা করতে চান বলেই তাদের ধারণা। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অবশ্য তাদের সে প্রয়াসকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নে যে স্থানীয় জমিদার-ভূ-স্বামীদের ভূমিকা দেখা যায়, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা চলমান। শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) উদ্যোগ

উদ্যোগ অর্থে এখানে নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগকেই বোঝানো হবে। গবেষণা এলাকার বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কওমী মাদ্রাসা, মক্তব, দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে জড়িত। মূলতঃ গ্রামীণ এলিটদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠছে। অর্থ, শ্রম, মেধা এবং নানারকম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত এসব উদ্যোগ বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালিত হয়। এ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি, স্থান নির্বাচন, শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালন এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম মনিটরিং অন্যতম। তবে এ ধরনের উদ্যোগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকার প্রশ্নে কখনো কখনো গ্রামীণ এলিটেদের মধ্যে দলাদলির রাজনীতি তৈরি হয়। এতে কখনো কখনো গ্রামীণ সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত বিবদমান পক্ষের মধ্যে সমঝোতা অথবা ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অবস্থানকে নিরঙ্কুশ করতে সক্ষম হন।

(২) উদ্বুদ্ধকরণ

বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সবার জন্য শিক্ষানীতির আলোকে গ্রামীণ এলিটেরা শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকার বিবেচনা করে শিক্ষার বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা পালনের আগ্রহ লালন করেন। শিক্ষাকে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী সমাজ ও মানব উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকরী উপাদান বিবেচনা করেন। তারা তাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে ছাত্র-অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের সে নৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তাদের উপলব্ধি মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক মুক্তি কখনোই আসবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ কথা মনে করবে যে, তাদের পরিবর্তন তাদের চেষ্টার মাধ্যমেই আসতে হবে এবং তারা যা চায় সেভাবেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে (Chowdhury, 1978:4)। শিক্ষাকে বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মনে করা হয় (Rahman, 1986:229)। সামাজিক কুসংস্কার সমস্যার সমাধানে শিক্ষার বহুমুখী ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এ কারণেই শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটেরা সাধ্যমতো ভূমিকা রাখতে চান। Rumi (1985) তার গবেষণায় লক্ষ্য করেছিলেন, বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও কিছু সংখ্যক গ্রামীণ এলিট এ ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করেন (Rumi, 1985:134)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় এ ধরনের অপতৎপরতার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা যে একেবারে বাধাহীন ও নিরুদ্বিগ্ন তা-ও নয়। বাধা বা প্রতিবন্ধকতা এলে বরং গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব

তৈরি হয়, যেটি উন্নয়ন দৃষ্টি ভঙ্গির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীণ এলিটদের শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা পরিমাপের দ্বিতীয় পরিমাপক হিসেবে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলকে ভিত্তি করে যে জরিপ চালানো হয় তাতে দেখা যায়, উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলকে শিক্ষার উন্নয়ন হিসেবে তারা বিবেচনা না করলেও এ কাজটি তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করতে চেষ্টা করেন। শুধুমাত্র নিজেদের সন্তানদের নয় বরং অনুসারী এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে নিরলস উদ্বুদ্ধ করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। শিক্ষা যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের অবিকল্প মাধ্যম সেই বোধে উজ্জীবীত করেন গ্রামীণ এলিটেরা। গবেষণা এলাকার এলিটেরা লজিং মাস্টার {স্থানীয়ভাবে জায়গীর বলা হয় (যারা গ্রামীণ এলিটদের বাড়িতে থেকে-খেয়ে তাদের সন্তানদের পড়াশুনা করায়)} রেখে তাদের সন্তানাদির পাশাপাশি সাধারণ গ্রামবাসীর সন্তানদের লেখাপড়ার পথ সুগম করে থাকেন।

বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটেরা নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগের প্রশংসা করলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তারা জানান, সরকার নারী শিক্ষা এবং অবৈতনিক উপবৃত্তি প্রদান করলেও স্থানীয় এলাকায় স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং কোনো মহাবিদ্যালয় না থাকায় এ অঞ্চলের নারীরা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মতে, শুধু তাদের এলাকায় নয় বরং সারা দেশের গ্রামাঞ্চলের চিত্র এ রকমই। গ্রামীণ এলিটেরা মনে করেন, সম্মান এবং জীবন মানের উন্নতির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য তারা তাদের মেয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অধিক যত্নবান এবং অনুসারী গ্রামবাসীদেরও এ ব্যাপাওে যথেষ্ঠ উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। তবে বিয়ে সংক্রান্ত দৃষ্টিকোন থেকে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে এখনো গ্রামীণ কিছু কিছু এলিট নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। উপযুক্ত পাত্রের অভাব এ ক্ষেত্রে উত্থাপিত সাধারণ অভিযোগ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গ্রামীণ শিক্ষিত তারুণ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বেশি ক্রিয়াশীল। উত্তরাধিকার সূত্রে সনাতনী পেশায় নিযুক্ত না হয়ে সরকারি চাকুরি প্রাপ্তির প্রত্যাশা এখন গ্রামীণ তরুণদের বৈষয়িক লক্ষ্য পূরণের প্রধান মাধ্যম। চাকুরিজীবি স্ত্রী সেখানে সহায়ক শক্তি।

সারণি ১.২-এ দেখা যায়, মোট ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট শিক্ষার উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখেন না বলে জানান। মূলতঃ এ শ্রেণীর এলিটেরা বয়স্ক এবং অল্প শিক্ষিত। শিক্ষার উন্নয়নে তাদের কোনো ধরনের ভূমিকা আছে কি-না তা তারা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারেন না। বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতা এবং শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণকে তারা উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করতে চান না। বরং গ্রামীণ এলিট হিসেবে এটা তাদের দায়িত্বশীলতা বলে মনে করেন। ৭ জন (৩.৫%) গ্রামীণ এলিট এ ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে

তাদের অবদানের মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত নন। যদিও মাঠ জরিপকালীন সময়ে দেখা গেছে, তারা ইরি-বোরো মৌসুমের পর স্থানীয় কওমী মাদ্রাসাগুলোকে ঋণ অথবা টাকা সাহায্য দিচ্ছেন। কিন্তু এটাকে তারা ঠিক ভূমিকা মনে করেন না, বরং পরকালীন শান্তির জন্যই এসব দান-খয়রাত গ্রামীণ এলিটেরা করে থাকেন। এমনকি মাদ্রাসার অনেক ছাত্রকে তারা লজিং রেখে পড়া ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে থাকেন।

(৩) বস্তুগত সাহায্য প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের এ ধরনের ভূমিকার মধ্যে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ সামগ্রী এবং শিক্ষা সামগ্রী প্রদান উল্লেখ্যযোগ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সরকারি-বেসরকারি অনুদান প্রাপ্তিতেও গ্রামীণ এলিটেরা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন। উদ্যোগ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং বস্তুগত সাহায্য প্রদানে গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছেন স্থানীয় এলাকায় শিক্ষার হারের ধারাবাহিক উন্নতি তারই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং নিষ্ঠাপূর্ণ এ ভূমিকাকে যথাপোযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কাঠামোবদ্ধ করা গেলে তার সুফলের ব্যাপ্তি আরো বেশি প্রসারিত হবে।

শিক্ষার উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ধ্রুপদী ভূমিকার মূল্যায়নে বলা যায়, শিক্ষার উন্নয়নে তারা যত্নবান এবং আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় এলাকার শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ার দায়ও অনেকটা তাদেরই। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পরিবর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বের প্রতি তারা অধিক মনোযোগী। আর এর জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ এবং তৃণমূলে রাজনীতির নতুন মেরুকরণ তৈরি হতে দেখা যায়। ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি তাদের এই বিশেষ মনোযোগের মূল লক্ষ্য শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তাদের ভূমিকা রাখা নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে কমযোগ্য বা অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে আর্থিক সুবিধায় লাভবান হওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এর ফলে মানসম্মত শিক্ষকের অভাবে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। নিজেদের সন্তানদের শহরের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর মাধ্যমে উন্নত ভবিষ্যত গড়ার যে অঙ্গীকার গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে দেখা যায় সাধারণ গ্রামবাসীর সন্তানদের শিক্ষার উন্নয়নে তাদের সে অঙ্গীকারের অভাবের দায় তাদের রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

কুসংস্কার, সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের অভাবে নানাবিধ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ। মূলতঃ গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক অন্যান্য সমস্যার ব্যাপকতা

স্বাস্থ্য সমস্যার গুরুত্বকে ম্লান করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সংবিধান স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার' (Millennium Development Goal-MDG) আলোকে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০২০ এর বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৫,৭৩২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪.৯২ শতাংশ (প্রথম আলো, ১জুন, ২০১৯)। যদিও ২০০৭-২০০৮ এর বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৫,৪৭০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬.২৭ শতাংশ। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬:১২৮)।

সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের পরও গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যাকে গ্রামীণ উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায় মনে করা হয়। এ অন্তরায় দূরীকরণে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেন। রোগ সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রামীণ এলিটেদের ভূমিকা অনন্য। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো:

সারণি- ১.৩: স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন	১৫৬ জন	৭৮%
শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন না	৩৭ জন	১৮.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	০৭ জন	৩.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.৩) অনুযায়ী ১২৯ জন (৬৪.৫%) গ্রামীণ এলিট স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখেন। এ ধরনের ভূমিকাকে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক, পরামর্শমূলক, চিকিৎসামূলক এবং বস্তুগত সাহায্যমূলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি পান, বাসি পচা খাবার না খাওয়া, শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ধরনের মহামারী সম্পর্কে সচেতন করা বিষয়গুলোকে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্যকে বস্তুগত সাহায্যমূলক, প্রাথমিক চিকিৎসা

ও ঔষধপত্র সরবরাহকে চিকিৎসামূলক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও হাসপাতাল সম্পর্কে পরামর্শকে পরামর্শমূলক ভূমিকার অর্ন্তভুক্ত করা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রম বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় গ্রামীণ এলিটেরা চাল, ডাল, টাকা, পয়সা এমনকি গাছের ফল-মূল (কলা, ডাব, ডালিম, পেয়ারা ইত্যাদি) দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে থাকেন এবং এ কাজটি তারা নিঃস্বার্থভাবেই করে থাকেন। সহমর্মিতার এ চিত্র গ্রামীণ সমাজেই সম্ভব শহুরে সমাজে তা দুর্লভ বটে।

উত্তরদাতা ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট চিকিৎসা ক্ষেত্রে অথবা স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখেন না বলে জানান। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং অল্প শিক্ষিত এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা চিকিৎসা সম্পর্কে অসচেতন এবং তারা নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারেই অন্য গ্রামীণ এলিটদের ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রয়োজনে তাদের অনুসারীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে টাকা-পয়সা ধার-কর্য দান করতে তারা কার্পণ্য করেন না।

উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ২৪ জন (১২%) এ সংক্রান্ত মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যতোটুকু সহযোগিতা তারা করেন সেটুকু ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে চান না।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৯)। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাণ ১০৯০ জনে দাঁড়িয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এ ভূ-খণ্ডের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কাজেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে একদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে মানব উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬:১৩০)। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে । পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর) ১৯৭৫ সালে শতকরা ৮ ভাগ হতে বর্তমানে ৬১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসস্টিকস, ২০১৮)।

পরিবারের কল্যাণই পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিবারের লোকসংখ্যা নিজেদের বস্তুগত সামর্থ্যের আয়ত্বের মধ্যে রেখে পরিবারের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার কথা পরিকল্পিত পরিবারের ধারণায় বলা হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় আনতে সর্বজনীন পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। যে সমস্ত উপকরণ বা যার মাধ্যমে গর্ভসঞ্চারে বাধা প্রদান করা

হয়, সে সমস্ত উপকরণ বা মাধ্যমকে সাধারণভাবে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয় (হক ও অন্যান্য ২০০৩:২৬২)। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাবের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে কুসংস্কারের কারণে এ হার আরো বেশি। জনসংখ্যা বেশি হলে তা পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য নানা মাত্রায় ও নানা বিবেচনায় ক্ষতিকর। অতিরিক্ত জনসংখ্যা জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায় ও হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। তাই পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নানামুখী সমস্যার কার্যকর এবং টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়। মোট কথা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক সুখ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ এলিটেরা যেমন নিজ নিজ পরিবারের টেকসই সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তেমনি সাধারণ গ্রামবাসীদেরও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

সারণি - ১.৪: জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

বয়সের স্তর	গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
২১-৩০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	১১ জন	৫.৫%
	মতামত প্রদানে বিরত	০৯	৪.৫%
	মোট	২০ জন	১০%
৩১-৪০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৫২ জন	২৬%
	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	০ জন	০%
	মতামত প্রদানে বিরত	১০ জন	৫%
	মোট	৬২ জন	৩১%
৪১-৫০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৬৩ জন	৩১.৫%
	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	৭ জন	৩.৫%
	মতামত প্রদানে বিরত	১৬ জন	৩১%
	মোট	৮৬ জন	৪৩%
৫১-৬০ বছর	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	৬ জন	৩%

	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না	১২ জন	৬%
	মতামত প্রদানে বিরত	১৪ জন	৭%
	মোট	৩২ জন	১৬%
	সর্বমোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি (১.৪) অনুযায়ী ২১-৩০ বছর বয়সী ১১ জন (৫.৫%) এলিট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান। এ শ্রেণির অবশিষ্ট ৯ জন (৪.৫%) গ্রামীণ এলিট অবিবাহিত হওয়ায় মতামত প্রদানে বিরত থাকলেও ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলে জানান। ৩১-৪০ বছর বয়স শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৫২ জন (২৬%) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই তাদের পারিবারিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে দ্বিধাহীন চিত্তে জানান। এ শ্রেণির ১০ জন (৫%) গ্রামীণ এলিট এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও কেউ নেতিবাচক উত্তর দেননি যেটি তাৎপর্যপূর্ণ।

৪১-৫০ বছর বয়সী গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৩.৫%) অতি রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পন হওয়ায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি হওয়ায় অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে তাদের এলিটিয় মর্যাদাও হুমকীর সম্মুখীন। এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে মোট ১৬ জন (৮%) গ্রামীণ এলিট পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের পরও সংকোচ বোধের কারণে জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন যেটি মাঠ জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে। ৫১-৬০ বছর বয়সী গ্রামীণ এলিট শ্রেণির ৬ জন (৩%) গ্রামীণ এলিট জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। অবশিষ্ট ১২ জন (৬%) এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক জবাব প্রদান করেছেন। প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অন্য ১৪ জন (৭%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মোট ৬ জন (৩%) এলিট সচেতন ও শিক্ষিত হওয়ায় ঝুঁকিমুক্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আস্থা রেখেছেন বলে জানান। সংকোচবোধ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৪ জন (৭%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনো জবাব প্রদান করেননি। মোট ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) গ্রামীণ এলিট জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন, যা জাতীয় পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের হারের চেয়ে (৬৬%-৬১.৬%=৪.৪% ভাগ) বেশি। নিজে না স্ত্রীরা পদ্ধতি গ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে জানাতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

আইসিডিআরবি'র (আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র) গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জন্ম নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে দুই

কোটি ৮০ লাখ বিবাহিত নর-নারী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ দম্পত্তি আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে জন্ম হার ৩ থেকে কমিয়ে ২.২ ভাগে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল, ২০০৭)।

নিজেদের পাশাপাশি গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের একান্ত অনুসারীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। যদিও নেতিবাচক প্রচারণা এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে ব্যাহত করার অভিযোগ রয়েছে এক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের বিরুদ্ধে (Rumi, ১৯৮৫: ১২০-১২৮)। কিন্তু গবেষণা এলাকায় এ ধরণের প্রবণতা লক্ষণীয় নয়। বরং গ্রামীণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিপরীতে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টিতে এলিটেরা অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গ্রামীণ এলিট-জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য তৈরি হয়েছে বলা যায়। এলিট শ্রেণির সচেতন প্রয়াসে গবেষণা এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে দাবি করা হয়েছে। এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও নিম্নমুখী। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা স্থানীয় সরকার, (ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ) ১৯৮৩ এর ৩৮(সি) ধারায় উল্লিখিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে থাকে (হক ও অন্যান্য, ২০০৩:২৬৫)। এ কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা বস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচীর সাথে এলিটেরাও উদ্বুদ্ধমূলক কাজ করে থাকেন। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ স্থাপনে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকর ভূমিকা রাখেন।

ক্যাফেটেরিয়া প্রক্রিয়া

ক্যাফেটেরিয়া প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটি জিনিস পছন্দ করা। কোনো পদ্ধতি কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না (হক ও অন্যান্য, ২০০৩:২৬৩-৬৪)। সংকোচ এবং লজ্জার কারণে সাধারণ মানুষ উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাইয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। গ্রামীণ এলিটদের সাথে অনুসারীদের এমন এক ধরনের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয় যাতে তারা তাদের সকল সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা গ্রামীণ এলিটদের কাছে অকপটে বলতে পারে। গ্রামীণ এলিটেরাও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার করে সঠিক পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন। পদ্ধতিগুলো হলো: (ক) অস্থায়ী পদ্ধতি (খ) স্থায়ী পদ্ধতি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে জাতীয় উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। সরকার সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য এবং জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণকে জনপ্রিয় করতে আন্তরিকভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

স্থানীয় এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি সেটিই প্রমাণ করে।

চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

চুরি-ডাকাতি গ্রামীণ সমাজে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর তফসিল-১ এর ২য় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ ইউনিয়নের অপরাধ দমন, চুরি, ডাকাতি রোধে পাহারা, টহলদারী এবং থানা পুলিশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক গ্রাম পুলিশের দ্বারা পুরো ইউনিয়নের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য তাই এর অধিবাসীদেরই কাজ করতে হয়। নিজ এলাকার নিরাপত্তা এবং চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটেরা রাতে পালা করে গ্রাম পাহাড়া, পুলিশের সাথে যোগাযোগ, সন্দেজনক ব্যক্তি সম্পর্কে থানায় রিপোর্ট প্রদান, গ্রাম পুলিশদের সহযোগিতা এবং স্থানীয় এলাকায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বারদের তাগিদ প্রদান করে থাকেন। সরকার কর্তৃক গৃহীত কমিউনিটি পুলিশিং এর নেতৃত্বেও রয়েছেন গ্রামীণ এসব এলিট। স্থানীয় এলাকার নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ এমন উদ্যোগ এবং কার্যক্রম গ্রহণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংহতির সংস্কৃতির এক অনন্য উদাহরণ। তাদের এ অনবদ্য ভূমিকা যেমন প্রশংসার দাবিদার তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় এলাকার সন্দেহজনক এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি সম্পর্কে এলিটদের মধ্যে কারো কারো উদাসীনতা অথবা নির্লিপ্ততা এবং কখানো কখনো পৃষ্ঠপোষকতা স্থানীয় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে এবং সংস্কৃতিগত উন্নয়ন সাধনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজে নৈতিকতাকে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত অনুশাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা বিকাশে গ্রামীণ এলিটেরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অপেক্ষাকৃত বয়ঃজোষ্ঠ গ্রামীণ এলিটেরা নৈতিকতার প্রশ্নে অধিক তৎপরতা দেখান। তরুণ শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ এবং খেলাধুলার ওপর জোর দেন। সম্প্রতি আকাশ সংস্কৃতির দাপটে গ্রামীণ সংস্কৃতি চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়। যুব সমাজের মননশীলতা বিকাশে যেটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতির আমদানীতে এক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা দায়ি। এ কারণেই গ্রামীণ সামাজিক জীবনের কঠোর বিধি-নিষেধ বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে এসেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিয়মিত খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির

বিকাশে এবং যুব সমাজের মনন গঠনে গ্রামীণ এলিটেরাই ভূমিকা রাখেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে যুব সমাজকে অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিজ সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। ব্যক্তি উদ্যোগে পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করার এবং তাদের মনন গঠনে প্রয়াস নেন এলিটেরা। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে যেমন তারা সক্রিয়, তেমনি ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনে যুব সমাজের উৎকর্ষ সাধনে এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালনেও গ্রামীণ এলিটেরা আন্তরিক। প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, মাদকের বিস্তার এবং গ্রামের ব্যাপক মানুষের শহরে স্থানান্তরের কারণে গ্রাম পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অতীত ঐহিত্য অনেকটাই ক্রমহ্রাসমান। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারে গ্রামীণ এলিটদের সন্তানদের আসক্তি এবং তরুণদের মাঝে মাদকের বিস্তারের ব্যাপারে এলিটদের উদাসীনতার কারণে সামাজিক ভারসাম্যের অভাবে গ্রামীণ স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্য বিনষ্ট হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

মাদকের বিস্তার রোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

মাদক এক অভিশাপের নাম। এ অভিশাপের কালো থাবা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামের উঠতি বয়সের তরুণেরা কৌতুহলবশতঃ ধুমপান শুরু করলেও সে অভ্যাস এক সময় আসক্তিতে পরিণত হয়। একসময় এ ধরনের আসক্তি তাদেরকে মাদকের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এ প্রলুব্ধি তাদের জীবনকে সর্বশান্ত করে দেয়। গ্রামীণ সমাজ নানা রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যাওয়ায় এর অতীত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। তারপরও সীমিত সক্ষমতা এবং দায়িত্বানুভূতির কারণে গ্রামীণ এলিটেরা মাদকের কবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষার প্রানান্ত চেষ্টা করে থাকেন। যুব সমাজের চলাফেরায় নজরদারী এবং তাদের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। তাদের উদ্যোগেই আসক্ত যুবককে সামাজিকভাবে বয়কট এবং শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এ ধরনের অপতৎপরতা রোধ করা বাহ্যত কঠিন হলেও সামাজিক বন্ধন শক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা সে অপতৎপরতাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে থাকেন। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে কেউ কেউ ধুমপায়ী হলেও ১০০% গ্রামীণ এলিটই মাদকের বিরুদ্ধে তাদের শক্ত অবস্থান তুলে ধরেছেন। তাদের এ অবস্থান সব সময় গ্রাম পর্যায়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে গ্রামীণ এলিটদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও মাদকের বিস্তার রোধ করা খানিকটা কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে গ্রামীণ এলিটদের এ উপলব্ধি স্পষ্ট যে, মাদকের বিস্তার রোধ করতে

না পারলে গ্রামীণ সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক গতিময়তা বিনষ্ট হবে। তাই গবেষণা এলাকার নিরীক্ষিত এলিটেরা মাদককে গ্রামীণ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং সংহতির জন্য হুমকি বিবেচনা করেন। নগরায়নের প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির প্রসার মাদককে গ্রামীণ পর্যায়ে সহজলভ্য করে তুলেছে। গবেষিত দুটি ইউনিয়নের মধ্যে শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় মির্জাপুর ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে মাদকের অধিক বিস্তার লক্ষণীয়।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

আইনের বিধান অনুযায়ী বাল্য বিবাহ বলতে সে বিয়েকে বোঝায় যেখানে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সে কোনো একজন শিশু। আর শিশু বলতে তাকেই বোঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বছরের কম এবং নারী হলে ১৮ বছরের কম। রাষ্ট্রীয় আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। জাতিসংঘ শিশু সনদেও নিষেধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী মেয়েদের প্রায় অর্ধেকেরই বেশি বিবাহিত এবং এ বয়সের শতকরা ৫৮ ভাগ ইতোমধ্যে মা হয়েছে অথবা সন্তান সম্ভবা (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০০১: ৯)। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১০-১৪ বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ ও ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ বর্তমানে বিবাহিত। গ্রামীণ পরিবেশে একদিকে ছেলেরা একটু বড় হলেই অভিভাবকেরা তাদের কাজে পাঠানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্যদিকে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্যও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে তাদের ধারণা, এতে আবার আইনের কী আছে? মেয়ে বিয়ে দেয়া একান্ত নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করে গ্রামের মানুষ। অথচ দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বাল্য বিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শিশু অধিকার পরিপন্থী। বেশিরভাগ দেশেই প্রচলিত আইনে বিয়েতে স্বাধীনভাবে নারীর সম্মতিদানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বহু দেশেই এ আইন প্রতীকী মাত্র। ১৯৯২ সন থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশে শিশু অধিকার সম্পর্কে সমাজের সকলের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে। এ ধরনের অধিকার শিশুদের সব সময়ই রয়েছে। তবে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে যা ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ১ লা জুলাই পর্যন্ত ১৯১ টি দেশ এ সনদটি অনুমোদন করেছে এবং এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শিশু সম্মেলন ঘোষণায় অন্যতম স্বাক্ষরদাতা দেশ এবং এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সনদে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে বিশেষ কিছু সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না। সম্প্রতি

সরকার উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতির ভিত্তিতে আদালতের পর্যবেক্ষণসাপেক্ষে ১৬ বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য আইন পাশ করেছে (বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

বাল্য বিবাহের কারণ

বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় বাল্য বিবাহের কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, কতিপয় মৌলিক উপাদান (factors) বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো পিতা-মাতার দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বাল্যবিবাহের ফলাফল সম্পর্কে অসচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়ন না হওয়া, দাদা-দাদর জীবদ্দশায় নাতবৌ দেখার প্রত্যাশা এবং যৌতুক পাওয়ার আকাঙ্খা। তাছাড়া বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ক প্রতিরোধ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার অন্যতম কারণ। বিবাহের ক্ষেত্রে কুমারীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। যার ফলে অননুমোদিত যৌন ক্রিয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা-মার দৃষ্টিতে বিয়ে হলো নিরাপত্তা বিধানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। কিশোরী মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে ওঠার বিষয়টি কোনো কোনো সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। তাদেরকে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হয় এবং এতে তাদের সুরক্ষা থাকবে বলে ধারণা করা হয়।

অশিক্ষা-অজ্ঞানতার বন্ধনে জড়ানো বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০% মেয়েই ১৫ বছরের মধ্যে মা হয়ে যায় (স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ১৯৯৬)। মাতৃ মৃত্যুর কারণসমূহের ওপর ১৯৭৬-৮৫ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার ২০-৩৪ বছর বয়সী নারীদের মাতৃ মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি (সার্ক মেয়ে শিশু পরিকল্পনা, ১৯৯১-২০০০)।

বাল্য বিবাহের এ ভয়াবহ সমস্যার আবর্তে দেশ যখন নিমজ্জিত, তখন তা প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় না হওয়ায় এর প্রভাব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষতঃ বর্তমান গবেষণা এলাকায় এর ভয়াবহ প্রভাব আরো বেশি লক্ষণীয়। স্থানীয় একটি পত্রিকার সূত্র ধরে বলা যায়, এ অঞ্চলে বাল্য বিবাহের কারণে স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী কমে যাওয়া, অপুষ্টি, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, শিশু-মাতৃ মৃত্যু বৃদ্ধি সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত পত্রিকায় বলা হচ্ছে প্রশাসনের উদাসীনতায় শেরপুর উপজেলার গাড়ীদহ, খানপুর, বিশালপুর (গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত) ও মির্জাপুর (গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত) ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় প্রতিদিন

বাল্য বিবাহের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সাম্প্রতি এ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণতঃ নিম্নবিত্তের পরিবারে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীদের বাল্য বিবাহ বেশি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দু'একটি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা হলেও প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে। স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধকারীরা যে স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ এলিট তা ধারণা করা যায়। উক্ত পত্রিকা আরো উল্লেখ করেছে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী এবং এনজিও'র প্রচেষ্টায় দু'টি বাল্য বিবাহ রোধ হলেও এর পেছনে প্রশাসন বা থানা-পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই (দৈনিক বগুড়া, ১৪ আগস্ট, ২০০৭)। স্থানীয় প্রভাবশালী এবং শিক্ষক এসব ব্যক্তি এলিট মর্যাদার অধিকারী ।

সারণি: ১.৫: বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিট

প্রদত্ত উত্তর	সংখ্যা	শতকরা হার
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন	১৩২ জন	৬৬%
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন না	৪৮ জন	২৪%
উত্তর প্রদানে বিরত	২০ জন	১০%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণি ১.৫ এ দেখা যায়, নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখেন। প্রথমতঃ বাল্য বিবাহের কুফল তুলে ধরে তারা নিয়মিত গ্রামবাসীকে সচেতন করেন। কদাচিৎ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের চেষ্টাও করে থাকেন। ইউপি নেতৃত্ব, শিক্ষক, গ্রাম্য ডাক্তার এবং রাজনৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা এ শ্রেণিভুক্ত। স্থানীয় সরকারগুলোকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। তাদের মতে জন্ম ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক এবং মানুষকে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক মাত্রায় সচেতন করা হলে বাল্য বিবাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৪৮ জন (২৪%) গ্রামীণ এলিট বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে তাদের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেননি। তাদের মতে, আইনের সঠিক বাস্তবায়নই প্রতিরোধের সর্বোত্তম মাধ্যম। এ ধরনের ভূমিকায় থানা-পুলিশ ও আইনী জটিলতা এবং প্রতিবেশিদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টির আশঙ্কায় এ শ্রেণির এলিটেরা এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা নিতে চান না। সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরামর্শ প্রদানেই তারা দায়িত্ব শেষ করেন। বাকী ২০ জন (১০%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং

কম সচেতনতাসম্পন্ন। বরং এসব এলিটদের বিরুদ্ধে স্থানীয় এলাকায় বাল্য বিবাহ সংগঠনের অভিযোগ রয়েছে। তবে গ্রামীণ এলিট শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার আলো বিকশিত হওয়ায় এ প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রচলন ব্যাপক। বাল্য বিবাহের ফলে পরিকল্পিত পারিবারিক জীবনের অভাবে দ্রুত সন্তান-সন্তানাদির জন্ম হয়, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠিত হওয়ায় উপার্জন হ্রাস পায়, কম বয়সে সন্তান জন্মদান করায় সন্তানের পুষ্টিহীনতার পাশাপাশি মায়ের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় এবং পুরুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। বাল্য বিবাহের এসব কুফল সম্পর্কে এলিটেরা সচেতন। তাই তারা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতার চেষ্টা করে থাকেন। এর কুফল সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সতর্ক করতে ভূমিকা রাখেন।

যৌতুক প্রতিরোধে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বিয়েতে জবরদস্তিমূলক লেন-দেন যৌতুক বলে পরিচিত। যৌতুক গ্রামীণ সমাজে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ রয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বিবাহের যে কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের নিকট হতে বিবাহের সময়, আগে বা পরে বিবাহের পণ হিসেবে যদি যৌতুক নেয় বা দাবি করে, তবে সে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে অপরাধ করেছে বলে গণ্য করা হবে। উক্ত আইনে বলা আছে 'যৌতুক বলতে যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে-

ক) বিবাহের এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে, অথবা

খ) বিবাহের যে কোনো পক্ষের পিতা-মাতা বা যে কোনো পক্ষের কোন ব্যক্তি বিবাহের সময়, আগে কিংবা পরে বিবাহের পণ হিসেবে নেয়, দেয় বা দাবি করে, বুঝায় (তবে ইসলামী শরীয়ত আইনে দেন মোহর যৌতুক পর্যায়ে পড়বে না)।

এ আইনে যৌতুকের শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা অথবা উভয়ের বিধান রয়েছে (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, যা ১৫ই জুন ১৯৮৫ হতে কার্যকর করা হয়েছে)। গ্রামীণ সমাজে উপরোক্ত আইনের কোনো কার্যকারিতা লক্ষ করা যায় না। এমনকি এ আইন সম্পর্কে সাধারণ গ্রামবাসীর অজ্ঞতা বিস্মিত হবার মতো বিষয় বটে।

সরকারি-বেসরকারি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা সত্ত্বেও যৌতুক বিরোধী কোনো মনোভাব সংশ্লিষ্ট গবেষণা এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। তাদের ধারণা মেয়ে পক্ষকে যৌতুক দিতেই হবে, না হলে তার মেয়ের বিয়ে হবে না। তাই মুখে অনেকে যৌতুকের বিরুদ্ধে কথা বললেও গোপনে তারা যৌতুক প্রথাকে সমর্থন করে। কার্যতঃ গ্রামীণ সমাজে অবৈধ এ পন্থাটি

উপঢৌকন বা উপহার হিসেবে বৈধতার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষণীয়। গরীবদের ক্ষেত্রে যেটি যৌতুক ধনীদের ক্ষেত্রে সেটি উপঢৌকন হয়ে যায়। যৌতুকের ব্যাপারে গ্রামীণ এলিটদের ভাবনা কী এবং এ ক্ষেত্রে তারা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা পরীক্ষার জন্য তাদেরকে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে তারা যৌতুক এবং বাল্যবিবাহকে সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সারণি ১.৬ যৌতুক ও বাল্যা বিবাহ সমস্যা বিষয়ে এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
যৌতুক ও বাল্য বিবাহকে মারাত্মক সমস্যা বিবেচনা করেন	১৬২ জন	৮১%
এ ধরনের সমস্যা অনুধাবনে মনোযোগী নন	২২ জন	১১%
মতামত নেই	১৬ জন	৮%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণিতে (১.৬) যৌতুক এবং বাল্য বিবাহকে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ১৬২ জন (৮১%) গ্রামীণ এলিট। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা যৌতুকের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের পাশাপাশি এটি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা, লেখা পড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ, আইনানুযায়ী শাস্তি সম্পর্কে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগান। তাদের মতে, আজ ছেলের বিয়েতে যৌতুক নিলে আগামীকাল মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে হয়। ফলে এ প্রথা কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ছাড়াও গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখে যৌতুক প্রতিরোধের চেষ্টা করে থাকেন। অধিকন্তু কেউ যৌতুক লেন-দেন করলে সামাজিকভাবে বয়কটের হুমকি প্রদান করেন। গ্রামীণ এলিটদের মতে, গ্রামীণ সালিশী মীমাংসার প্রায় ৬০-৭০ ভাগ সালিশ সংগঠিত হয় যৌতুকের কারণে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য। তাই এ ব্যাপারে গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বহাল রাখার জন্য যৌতুক মুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। মোট ২২জন (১১%) যৌতুককে সামাজিক সমস্যা মনে করেন না। এ শ্রেণির এলিটেরা বেশিরভাগই বয়স্ক এবং স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় যৌতুকের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তাদের ধারণা ক্ষীণ। তাদের মতে, যৌতুকের লেন-দেন সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ সমাজে আজও

বিদ্যমান। তাই এটিকে সামাজিক সমস্যা বলতে তারা নারাজ। উল্টো তারা ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী গ্রামীণ এলিটদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তারা মানুষের বেলায় যৌতুককে সামাজিক সমস্যা বললেও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে ঠিকই যৌতুকের লেন-দেন করেন। উত্তরদাতা বাকী ১৬ জন (৮%) এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন।

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ অন্যান্য সামাজিক উৎসবের মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে গ্রামীণ এলিটরাই নেতৃত্ব প্রদান করেন। ধর্ম গ্রামীণ সমাজ জীবনকে মানা মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামবাসীর ধর্মীয় জীবনপ্রবাহে প্রভাব বিস্তার করেন। মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় শিক্ষার পথ সুগম করেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ১৭৫জন (৮৭.৫%)। সমাজের সংহতি রক্ষায় এবং সমাজের নৈতিকতা ধরে রাখতে ধর্মের ভূমিকা অনন্য। গ্রামীণ সমাজে তাই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা বরদাস্ত করা হয়না। এ ধরনের অবহেলায় কখনো কখনো আর্থিক, মানসিক অথবা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হয় । মূলতঃ গ্রামীণ সমাজ জীবনে পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে গ্রামীণ এসব এলিট ধর্মীয় নীতিমালাকে অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন।

ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি আয়োজনেও গ্রামীণ এলিটেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান গবেষণা এলাকার মূল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে মহরম, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, শবে-ই-বরাত, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং ধর্মীয় জালসা উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্বে গোষ্ঠী সমাজে ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজের সদস্যদের ওপর নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নির্ধারণ করা হয়, যা সমাজের সকল সদস্যদের দেয়া বাধ্যতামূলক। তবে চাঁদার হার নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর (Karim 1990:123)। পরকালীন সুখ অথবা সমাজে প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বেশি চাঁদা প্রদান করে থাকেন । ঈদুল ফিতর (রোজার ঈদ) এবং ঈদুল আযহা (কোরবানী ঈদ) গ্রামীণ সমাজে প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব। সাধারণতঃ খোলা মাঠ অথবা মসজিদে এ নামাজ অনুষ্ঠিত হয় (Karim 1990:123)। তবে বর্তমান গবেষণা এলাকায় এ ধরনের নামাজের জন্য ঈদগাহ মাঠ আছে। এসব ঈদগাহ মাঠের সার্বিক তদারকির দায়িত্ব পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা। সমাজের সদস্যদের প্রদানকৃত ফিৎরার টাকা 'মাতব্বর' গ্রামীণ এলিট নামাজ শেষে দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করে দেন। ঈদুল আযহার নামাজ শেষে গ্রামীণ এলিটেরা পশু কোরবানী করে থাকেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান গ্রামের মিলন মেলায় পরিণত হয়। কোরবানীর সার্বিক আয়োজনে এবং দুস্থদের মাঝে মাংস বিতরণ ও পশুর চামড়ার মূল্য বিতরণে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ সমাজে এখনো ইসলামী জালসার আয়োজন করা হয়। ইসলামী জালসা সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য অর্থ এবং শ্রম দিয়ে গ্রামীণ এলিটেরা ভূমিকা রাখেন। গ্রামের মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধিতে এবং ধর্মীয় ইবাদত নিয়মিত পালনে উদ্বুদ্ধ করতে এসব জালসার গুরুত্ব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক। তাছাড়া এসব মাহফিলকেন্দ্রিক উৎসাহ গ্রামীণ সমাজের সংহতিকে দৃঢ় করে।

গ্রামের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে নিরলস ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ এলিটেরা। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য মিলাদ আয়োজনেও নেতৃত্ব দেন তারা।

নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটের মধ্যে বয়স্ক, ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ ধর্মীয় ভূমিকার প্রতি অধিক যত্নশীল এবং ভূমিকা পালনে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন।

ধর্মীয় অনুশাসনকে গ্রামীণ সমাজ পরিচালনার অন্যতম অনুসঙ্গ বিবেচনা করা হয়। সামাজিক অপরাধ-ব্যভিচার নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় বিধি-বিধানকে প্রাধন্য দেয়া হয়। আর এই প্রেক্ষিতেই গ্রামীণ সমাজে বহুল ব্যবহৃত ফতোয়ার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। আরবী শব্দ 'ফতওয়া' মূলধাতু 'ফাতা' থেকে এসেছে। এর অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ফতোয়ার ধারণার উন্মেষ ঘটে। তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান। পরবর্তীতে জ্ঞান যখন হাদীসের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ফতোয়া রায় ও ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয় (রহমান, ২০১৮:১৮১)।

নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ২৫জন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। গ্রামীণ এসব এলিট তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ যেমন মাঘী পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী পূর্ণিমা, রথযাত্রা, দূর্গা পূজা, লক্ষী পূজা, কালি পূজা ও সরস্বতী পূজা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৃতের সৎকার, শ্বশান রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন উৎসবাদি আয়োজনে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সামাজিক সুশাসন এবং এলিট

সুশাসন প্রত্যয়টি স্থানীয় অথবা জাতীয় যেকোনো সংগঠনের সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ সমাজ নামক সংগঠনটির ক্রমবিকাশ এর জনগোষ্ঠীর সংহতি এবং জীবন ঘনিষ্ঠ কর্মতৎপরতার ওপর ভর করে এগিয়েছে। শতাব্দীর চাকা যতো ঘুরেছে গ্রাম এবং শহরের দূরত্ব ততো কমেছে। ফলে শুধুমাত্র জীবন, সম্পদের জন্যই নয় বরং মানবিক মর্যাদার সুরক্ষার জন্য গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের

যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছে। প্রক্রিয়াটি সহজ ছিল না। অনুগত-অনুসারীদের শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শনে অনীহা এবং সমাজ সংগঠনের রীতিবদ্ধ রীতি-নীতির প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করার মতো অর্জিত গুণ এবং কৌশলের অনুপস্থিতি গ্রামীণ নেতৃত্বের সনাতনী কাঠামোই বদলে দিয়েছে। পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিজেদের মানিয়ে নেয়ার দক্ষতাসম্পন্ন নেতৃত্ব টিকেছে। তবে তাদের কৌশলের রদবদল করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব এবং অনুসারীদের মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ অব্যাহত রয়েছে। উভয়ের জবাবদিহিতার সংস্কৃতি, নৈতিক মানদণ্ডে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচরণকে পরিমাপ করা, ন্যায়ের শাসনের প্রতি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ সামাজিক সুশাসনের পরিচয় বহন করে। তৃণমূলে জাতীয় রাজনীতির অপরিকল্পিত বিকাশ এবং গ্রামীণ এলিটদের সমাজ সংগঠনকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করার অপরিনামদর্শী পদক্ষেপে সেই সুশাসনের প্রক্রিয়া কখনো কখনো ব্যাহত হয়। তবে আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজের অন্তরঙ্গ পারস্পরিক সমঝোতামূলক সহাবস্থান এর স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সেই স্বকীয় চেতনার ধারক, বাহক এবং রক্ষক গ্রামীণ এলিট। গবেষণা এলাকায় কিঞ্চিত ব্যতিক্রম ছাড়া গ্রামীণ এলিটেরা স্বকীয় চেতনায় সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক বলে দাবি করা যায়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও কিছু নীতি পরামর্শ

১. ধ্রুপদীকাল থেকে কেবলমাত্র গ্রামীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় এলিটদের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হতো। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকার এক অন্তরঙ্গ চিত্র উদঘাটিত হয়েছে।

২. গ্রাম্য উপদলীয় দলাদলী (ঋধপঃরড়হ) গ্রামীণ সমাজ জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতো বলে প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিপরীতে বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদানের এলিটীয় প্রতিযোগীতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে যা গ্রাম গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে ধারণা করা যায়।

৩. ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, বংশ মর্যাদা ও শিক্ষার সাথে সাথে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম মূল নিয়ামক উপাদান হিসেবে পাওয়া গেছে বর্তমান গবেষণায়।

৪. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে গ্রামীণ সমাজের নানা সমস্যা ও সংকট নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের বহুমুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও ব্যক্তি অবস্থান থেকে গ্রামীণ এলিটদের সনাতনী ভূমিকার বিদ্যমান কার্যকারিতা তাদেরকেই গ্রামীণ উন্নয়নের মূল এজেন্ট

হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

৫. নানা কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

৬. সরকারি-বেসরকারি পৃষ্টপোষকতা ও প্রণোদনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকাকে আরো বেশি সমন্বিত, কার্যকর এবং প্রাণবন্ত করা সম্ভব।

উপসংহার

স্থানীয় এলাকার অনানুষ্ঠানিক (কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষও বটে যেমন ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ) কর্তৃপক্ষ হিসেবে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আন্তরিক প্রয়াসই তাদেরকে স্থানীয় এলাকায় এলিটীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। গ্রামীণ সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের যে ভূমিকা তা বিশ্লেষণের দাবি নতুন করে জোরদার হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার সামাজিক সমস্যা উত্তরণের সাথে সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন আকাঙ্খার সফল এবং পরিশীলিত বাস্তবায়ন ঘটাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী গ্রামীণ এলিটেরা যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে পরিবর্তিত বাস্তবতায় এবং গ্রামীণ ধ্রুপদী সমাজ নামক সংগঠনের ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তনের কারণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা পালনেও রদবদল হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চার মাত্রা গ্রামীণ সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রামীণ এলিটদের তুলনায় তরুণ উদীয়মান এলিটদের ক্ষমতা চর্চার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক এসব সংগঠনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠানের জন্য তাই এলিটদের মধ্যে এক ধরনের অপ্রকাশ্য প্রতিযোগিতা বজায় থাকে যা প্রধানত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এর ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়। এ মেরুকরণে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি গ্রামীণ এলিটদের বিশেষ দুর্বলতা লক্ষ করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আলম, খুরশিদ, বাংলাদেশের উন্নয়নে জন-অংশগ্রণ: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৬।

২. ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: মেহের পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০০৩।

৩. করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী, ঢাকা: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

৪. জানসেন, এরিক. জি. (বাংলায়), গ্রামীণ বাংলাদেশ: সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০।

৫. দৈনিক বগুড়া, বগুড়া: ১৪ আগস্ট, ২০০৭।

৬. প্রথম আলো, ঢাকা: ১ জুন, ২০১৯।

৭. প্রথম আলো, ঢাকা: ২৪ এপ্রিল.২০০৭।

৮. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯, ।ি.হিধহমষধফবংয.মড়া.নফ.

১০. বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসস্টিকস, ২০১৮, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন, ২০১২।

১২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মে, ২০১৯।

১৩. বেগম, রহিমা, রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ, (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

১৪. বিশ্বাস, শীলা, গ্রামীণ বাংলাদেশে বিরোধ ও বিরোধ নিস্পত্তি: সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ২০০২।

১৫. রহমান, আতিউর, বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম, ঢাকা: প্রবর্তক প্রকাশনী, ১৯৯১।

১৬. রহমান, তারেক মুহম্মদ তওফীকুর, রাজনীতিতে আলিম সমাজের প্রভাব (বাংলাদেশ ১৯৭২-২০০১), ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স ২০১৮।

১৭. শহিদুল্লাহ্, মোহাম্মদ, গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট: কুমিল্লা জেলার উত্তর গৌহাটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষণ (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯২।

১৮. স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ১৯৯৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৯. হক, একে শামসুল ও অন্যান্য (সম্পা.), ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ঢাকা: এনআইএলজি, ২০০৩।

20. Amsden, Alice H., Dicapria, Alisa and Robinson, James (ed.), The role of Elites in Economic Development, London: Oxport University Press, 2012.

21. Bonjen, C.M. and D.M. Olson, Community Leadership: Directions for Research, Administrative Science Quarterly, Vol. IX. No. 3 December, 1964.

22. Bottomore, T.B., Elites and Society, London: C.A. Watts, 1964.

23. Chowdhury, D. Poult, New Partnership in Rural Development, New Delhi: M.N. Publishers, 1978.

24. Dahl, Robert A., Who Governs, New Haren: Yale University Press, 1963.

25. Dube, S.S., Indian Village, London: Routledge & Kegan Pal, 1951.

26. Endruweit, Gunter, Elites as agents of economic development in Verlag Waltarchiv, Hamburg, Vol. 19, Iss 1, 1984.

27. Giddens, Anthony, Elites in the British Class Structure, in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press, 1973.

28. Hunter, Floyd, Community Power Structure: A Study of Decision Makers, Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.

29. Jennings, M.K., Community Influentials: The Elites of Atlanta, London: The Free Press of Glencoe, 1964.

30. Karim, A.H.M. Zehadul, Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh, (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.

31. Karim, A.H.M. Zehadul, Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages, Dhaka: University Grants Commission, 1979.

32. Karim, A.H.M., Zehadul, The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society, New Delhi: Northern Book Center, 1990.

33. Kornhauser, William, The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal., 1965.

34. Lasswell, H.D. et. al. The Comparative Study of Elites, Standford: Hoover Institute, 1952.

35. Linton, R., The Study of Man, New York: Appleton Century, 1936

36. Mead, G. H., Mind, Self and Society, C.W. Morris (ed.), Chicago: The University of Chicago Press, 1934.

37. Mills, C. Wright, The Power Elite, New York: McGraw Hill Book Company, 1956.

38. Pareto, Vilfredo, The Mind and Society, New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.

39. Rahman, Atiur, Peasants and classes: A study in Differentiation in Bangladesh, Dhaka: The University Press Ltd., 1986.

40. Rumi, Syed Nasar Ahmed, Rural Elites and their Role in Development: A Case Study in Kustia District (Unpublished M.Phil. Thesis), Rajshahi University: IBS, 1985.

41. Schulze, R.O. and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites, The American Journal of Sociology, 13 (3), 1959.

42. Sebudubudu, David & Molutsi, Patrick, The Elite as a Critical Factor in National Development –The Case of Botswana, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2011.

43. Sharma, S.S., Rural Elites in India, Delhi: Sterling Publisher, 1979.

44. Singer, Marshall, The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon, Cambridge: The Press, 1964.

45. Sing, Harjinder, Authority and Influence in two Sikh Villages, 1976.

46. T.R. Sarbin, Role Theory, G. Lindzey, (ed.) Hand Book of Social Psychology, Vol.1, and Cambridge: Mass: Adison-Wesley, 1954.

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি

তানযিনা আক্তার[১]

Abstract

The term 'femininity' is closely related to the overall development of most of the countries of the world including Bangladesh. One of the basic concerns of femininity is ensuring an environment conducive to reduce gender disparity. So far, Bangladesh has achieved significant progress in terms of narrowing down the gender gap in all spheres of the society. Still we have a long way to go for achieving gender parity. In this article attempts have been made to clarify 'femininity'; the changing role of women with the evolution of the society; scenario of gender parity in Bangladesh; obstacles to gender parity; and way forward. Data, information have been collected from secondary sources and collected in a critical manner.

ভূমিকা

নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি (Femininity) শব্দটি আলাদা করে এই প্রবন্ধটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যা পাওয়া যায় সামাজিক মনোবিদ গির্ট হবস্টিডের (১৯২৮-২০২০) 'ক্যালচারাল ডাইমেনশন থিওরি' বা সাংস্কৃতিক মাত্রার তত্ত্ব- এর 'ম্যাস্কিউলিনিটি ভার্সেস ফ্যামিনিনিটি (Masculinity vs Femininity)' বা পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব তত্ত্ব থেকে। এখানে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় ৭৬টি দেশের মধ্যে পুরুষত্ব সূচকে (Masculinity Index) ৫৫ নম্বর পেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৩০তম। বাংলাদেশের চিরাচরিত বা ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থাটিই পুরুষতান্ত্রিক যা হবস্টিডের অনুসন্ধানেও উঠে এসেছে (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010)। বিশ্বে নারীর অবস্থান উন্নত করতে বা লিঙ্গ সমতা অর্জন করতে একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশ্বে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী ১.৬ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতিদিন সহস্রাধিক নারী সহিংসতার শিকার হন, যেমনঃ যৌন নির্যাতন, পাচার এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ, ইত্যাদি। ২০১০ সালে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২,৮৭,০০০ (দুই লক্ষ সাতাশি হাজার) যার বড় একটি অংশের অবস্থান ছিল সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে মাধ্যমিক

১ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার , ঢাকা। ই-মেইল: tanzina.bpatc@gmail.com

স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম যা পরবর্তীতে নারীদের জন্য কর্মে যোগদানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (Flash Eurobarometer 372, ২০১৩)। নির্দিষ্ট করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকে দেশের জনগণ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রবৃদ্ধির ছোট ছোট বুনিয়াদ দেখতে পাওয়া যায়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক চেতনার কিছু পরিবর্তন ঘটছিল যা বাংলাদেশের বর্তমান দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের পরিচয়কে ধারণ করে। সামাজিক যে পরিবর্তনগুলো বর্তমান বাংলাদেশে ঘটছে তা কতটুকু উন্নয়নের সংজ্ঞায় পড়ে বা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু, অত্যাবশ্যকভাবেই, সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধানের একটি উপলক্ষ্য হলো সমাজে নারীর অবদান বা ভূমিকা। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজে সকলেরই আশা ছিল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র (নারী-পুরুষ) নির্বিশেষে সম-অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করার। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজ বা জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন উপলক্ষে নারী-পুরুষের ভূমিকায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তাই, সহস্রাধ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের জন্য নারীর উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অর্থনৈতিক খাতে নারীদের বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন তথা নারীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি'র বৈশিষ্ট্যগুলো সহায়তা করবে।

এই প্রবন্ধটিতে নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নের একটি পন্থা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অতীত থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা, যেমন নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, তার সমাধানে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে এবং কিছু সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রধানত পরোক্ষ উৎস হতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমনঃ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল-নিবন্ধ, অনলাইন-নিবন্ধ, ইত্যাদি। এছাড়াও, সরকারি-বেসরকারি রেকর্ড, বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে, বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার উপায় অনুসন্ধানে হবস্টিডের পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব (Masculinity vs. Femininity) তত্ত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্য করণীয় সম্পর্কে কিছু ধারণার উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুগের পরিবর্তনে নারীর অবস্থান

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজে (গতানুগতিক বা আধুনিক) নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণে একটি সাধারণ ট্রেন্ড দেখতে পাওয়া যায়, যেমনঃ প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই পুরুষেরা ঘরের বাইরে

কাজ করে থাকেন (যেমনঃ পশু শিকার, বাণিজ্যকর্মে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ থেকে বর্তমানের কৃষি কাজ বা ব্যবসা-চাকুরী করে অর্থ উপার্জন)। অতীতে পরিবারের পুরুষদের দায়িত্ব ছিল স্ত্রী ও সন্তানদের বাহিরের কোন আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অন্যদিকে, নারীরা পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের সেবা করবে, যার দায়িত্ব আধুনিক সমাজেও নারীর উপরেই বর্তায় (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010)। নারীর অবস্থান সবচেয়ে শোচনীয় ছিল দাসী হিসেবে। অন্ধকার যুগ থেকে মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার বা কেনাবেচা করা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়। সে ব্যবস্থায় নারীদের উপপত্নী রূপে ব্যবহার করাও স্বাভাবিক ছিল। সুলতানী আমল থেকে বাঙলায় দাস-দাসী আমদানির কথা জানা যায়। সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা-তে কৃষিনির্ভর দাসের ব্যবহার দেখা যায় (ইসলাম, ২০১৪)। সুতরাং, দাস হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ পারিবারিক কাজে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষেত্রেই উল্লেখ করার মতো। বর্তমান যুগেও কৃষিনির্ভর সমাজে বেতনভূক্ত না হয়েও নারীরা অনেক অবদান রাখছেন। অন্যদিকে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের মূল্য দেয়া হয়না। এমনি করে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই তারা প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে পুরুষদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আঠার-ঊনিশ শতকের দিকে, যখন বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল, সমাজে পুরুষদের প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান ছিল। সেসময় নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, পুরুষ সঙ্গ ব্যতীত নিজ বাসস্থানের বাইরে যেতে পারত না। জন্মের পর থেকে পিতার শাসন, বড় ভাইয়ের বাঁধা-নিষেধ, বিয়ে পরবর্তী সময়ে পরিবারের শৃঙ্খল ও স্বামীর আদেশ, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের আনুকূল্যে নারীর জীবন পার হয়ে যেত। নারীদের পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তথা নিজের মত প্রকাশ করার মত মানসিকতাও ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে নারী সর্বদা সামান্য স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারত (সেনগুপ্ত, ২০১৫)। পরবর্তীতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপ, সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ, উদারচিন্তার পত্র-পত্রিকার প্রচার, বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম, এবং নারীবাদী লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়ার কর্মকান্ড নারীদের সমাজের অংশ, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার তথা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। শিক্ষার আলোই ধীরে ধীরে নারীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের অনুশীলন করায়। বিশেষতঃ 'নারীজাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত বেগম রোকেয়া একই সাথে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী, নারীর মুক্তি, নারীর উজ্জীবন, নারীর পুরুষতুল্য প্রতিষ্ঠা (সৈয়দ, সম্প., ২০১৭)। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সমকর্মক্ষমতার পরিচিতি পাওয়া যায়। নারীকে সামাজিকভাবে অক্ষম রেখে একটি সমাজ তথা দেশের উন্নতি হতে পারেনা। একজন পুরুষ সমাজকে তার জ্ঞান দিয়ে যেমন উপকৃত করতে পারে, একজন নারীও ঠিক তেমন ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে শারীরিক

শক্তি প্রদর্শন করে পুরুষের অহংকার করার কিছু নেই। বেগম রোকেয়ার এই বিংশ শতাব্দীর চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় একটি নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নারীদের অধিকার আদায়ের অন্দোলনকে 'নারীবাদ (Feminism)' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটি মূলত নারী সম্বন্ধীয় মতবাদ। 'ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে নারীকে নিজ অধিকার আদায় তথা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে' (আহমেদ ও বর্মণ, ২০০৯)। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নারীবাদী বিভিন্ন আন্দোলন পাওয়া যায়, যেমনঃ নাগরিক অধিকার তথা ভোটাধিকার লাভ, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসে সম-অধিকার প্রাপ্তি, পুরুষের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য আন্দোলন করা, ইত্যাদি। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ২০১২ সাল থেকে চলমান নারীবাদের চতুর্থ জোয়ারের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সেগুলো মূলত যৌন হয়রানি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা কেন্দ্রিক। তাত্ত্বিক দিক বিবেচনায় নারীবাদ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বা নানা ঘরনার মতবাদ (উদারপন্থী, র‍্যাডিক্যাল, মার্ক্সীয়, সমাজতান্ত্রিক, অস্তিত্ববাদী, ইত্যাদি) পাওয়া গেলেও তা দ্বারা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান এক স্থানে আনা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত স্বাধীনতার পূর্বেই হয়েছিলো। ঊনিশ শতকে এর ভিত্তি ছিল সামাজিক সংস্কার, যেমনঃ মেয়ে শিশু হত্যা, বাল্য বিবাহ ও বিধবা পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করা, ইত্যাদি। পাকিস্তান আমলে আন্দোলন রাজনীতি কেন্দ্রিক বা জাতীয় জীবন কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতির পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আন্দোলন গড়ে উঠে। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীবাদীদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় কেননা অনেকেই ভাবেন নারীবাদীরা ধর্ম, সংসার, দেশের ঐতিহ্যবাহী নিয়মনীতির পরিপন্থী এবং অনেকক্ষেত্রে পুরুষ বিদ্বেষী। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জেন্ডার বা লৈঙ্গিক সমতা গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এখানে বদ্ধমূল ধারণা হল নারীরা ঘরে থাকবে, পর্দা করবে এবং বিনয়ী (মডেস্ট) হবে। নারীবাদ নিয়ে এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণ হতে পারে জনগণের অশিক্ষা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। কারণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে পুরুষরাও নারীবাদী হতে পারে (আক্তার, ২০২১)।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীবাদী কর্মীদের পাশাপাশি অনেক সংস্থা কাজ করছে। কিছু সংস্থা মহিলাদের আইনগত এবং মানবিক পরামর্শ দিয়ে সহয়তা করে থাকে, আবার কিছু সংস্থা সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারীপক্ষ, আইন-ও-শালিশ কেন্দ্র, 'নিজেরা করি',

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, 'আমরাও পারি', নারী প্রগতি সংঘ, মহিলা মহিলাদের জন্য, উন্নয়নের পথে পদক্ষেপ (স্টেপস টুয়ারডস ডেভেলপমেন্ট), ব্র্যাক জেন্ডার রিসোর্স কেন্দ্র, 'বাচতে শেখা', বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ইত্যাদি সংস্থাগুলো দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারপরও, বাংলাদেশে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা' যুগোপযোগী করতে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার দেয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। তখন বিভিন্ন দল থেকে বিরোধিতা আসে যেখানে মূলত ধর্ম ভিত্তিক দলের প্রভাব বেশি ছিল (মওদুদ, ২০১১)। এরূপ প্রতিক্রিয়ায় মুখে সম্পদের সমান বণ্টন নিশ্চিত করা যায়নি। যদিও সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-২৮(২)'তে সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং অনুচ্ছেদ নং-১০-এ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি বা নতুন কোন ধারা গ্রহণ করে নেয়ার বিষয়টি একটি দলীয় বা সামাজিক মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯৫০-এর দশকে নারীকে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু উন্নয়ন আনয়নে নারীর ভূমিকা অনুধাবন করতে আরও এক দশক অপেক্ষা করতে হয়। 'নারী এবং উন্নয়ন' ধারার তাত্ত্বিক স্থানান্তর হয়ে বর্তমানে 'লিঙ্গ (জেন্ডার) এবং উন্নয়ন' আলোচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে জেন্ডার নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেননা নানারকম উন্নয়নের প্রভাব নারী বা পুরুষের উপর পৃথক পৃথকভাবে পড়ে। আধুনিক ব্যবস্থার স্মার্ট অর্থনীতিতে মানব সম্পদ হিসেবে নারী-পুরুষের ব্যবধান সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বড় বাঁধার সৃষ্টি করছে (Chant, 2012)। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সিভিল সার্ভিসে কর্মরত নারীরা পুরুষদের থেকে কম প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস পেয়ে থাকে। নারীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা পদোন্নতির সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্যায়নও করা হয়না। অন্যদিকে দেখা যায়, নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হননা। তাদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সময় তারা ক্যারিয়ার থেকে পরিবারকে বেশি গুরুত্ব দেন। স্বাভাবিকভাবেই কর্মজীবী নারীদের বাংলাদেশে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয়; একটি কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন এবং অন্যটি নিজ পরিবারের যত্ন নেয়া। এসকল বিষয়ই নারীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্য সুপারভাইজারের কাছে তারা লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বা নেতিবাচক আচরণও পেয়ে থাকেন (Khair, Haque, & Mukta, 2020)। এরকম নানাবিধ সমস্যার সমাধান শুধু মানসিকতার বা একটি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই আনা সম্ভব। উপরন্তু, বাংলাদেশ সরকার নারীদের জাতীয় উন্নয়নে মূলধারায় আনতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই নারীদের ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি চাকুরীতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' যাকে পরবর্তীতে প্রয়োজন ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের কর্মে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য নানাধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েদের অন্যান্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কার্যালয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে 'উইমেন্স ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'জাতীয় মহিলা সংস্থা'ও সে সময় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যদিকে, মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাও চালু করা হয় (হোসেন, ২০২১)।

স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে নারীর অংশগ্রহণ অবধারিতভাবেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের একটি ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছিল নামেমাত্র। প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আত্মীয় স্বজনই সেখানে মনোনীত হতেন। একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে। সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতিরেকে সাধারণ সদস্য হিসেবে ১১০ জন নারী নির্বাচিত হন যা সরকারের একটি সাফল্য হিসেবে সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, নারী সদস্যরা উন্নয়নমূলক কাজে পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ফলে, ২০০৩ সালের নির্বাচনেই নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। স্থানীয়ভাবে নারী প্রতিনিধিদের অবদান দৃশ্যমান হয় শুধু পোশাক শিল্প, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ও ভোট প্রদান খাতে (নাজমীন, ২০১৪)। আইনগত ভিত্তি জোরদার করতে বা নারী সহয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যেমনঃ বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০০৭, পর্ণগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, মানবপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২, শিশু আইন ২০১৩, ইত্যাদি। এছাড়াও, বর্তমান সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে (মাহমুদ, ২০১৯)। ধর্ষিত বা নির্যাতিত নারীদের একই স্থাণে স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাওন্সেলিং, আশ্রয় সেবা, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা প্রদানের জন্য ১২ টি জেলার মেডিক্যাল কলেজে স্থাপন করা হয়েছে 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)'। একই সাথে দেশব্যাপী নির্যাতিত নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস

সেল (ওসিসি) গঠন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য ২০১১ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'জয়িতা' শীর্ষক একটি কর্মসূচি শুরু করেছিল যা বর্তমানে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' নামে একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনে ঋণ সহয়তা প্রদান করা হয়। বাজার চাহিদার নিরিখে জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত ব্যবসাসমূহে নারীদেরকে সম্পৃক্ত হতে সহয়তা করে। তদুপরি জয়িতা'র ব্র্যান্ডে পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে ব্যবসা অনুকূল ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় লিঙ্গ সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাতের আকাঙ্ক্ষিত মাত্রা অর্জন করতে পেড়েছে। তাছাড়া, সরকারি ব্যবস্থায় গ্রামের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা ও বেতন মওকুফ করা হয়েছে। 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৪' অনুযায়ী ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০ম স্থানে রয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ 'Women in Parliaments Global Forum Award'পেয়েছে। তারপরও, এ দেশের নারীরা মজুরি কর্মসংস্থান (wage employment)-এ নিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে মাত্র ১ জন নারী অ-কৃষি খাতে মজুরি কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন (Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015, p.43)। আবার, এমন অনেক উদাহরণ বাংলাদেশে পাওয়া যাবে যাতে দেখা যায় সরকারের নারী উন্নয়নের কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক উন্নয়নে অর্জন সীমিত। কার্যক্রমগুলো সমাজের নিম্নস্তরে এসে কোন সফলতা খুঁজে পায় না বা সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জন লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করণের হার, বয়স্ক শিক্ষার হার, মহিলা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, বনায়ন, এবং তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি (GED, 2015)। ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে নারীর ক্ষমতায়নের (অনুচ্ছেদ নং ৩.১২) জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনুপাত বৃদ্ধি করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে নারী নিয়োগ বৃদ্ধি করা, 'জয়িতা' ফাউন্ডেশনের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির সমতা নিশ্চিত করা, গ্রামীণ নারীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মপরিবেশ উন্নত করা, গ্রামীণ নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ডে কেয়ার সেন্টার' চালু করা, ইত্যাদি। বিগত বছরগুলোতে সরকার ৬ মাসের মাতৃকালীন ছুটি, ব্যক্তির নামের পরে পিতার সাথে মায়ের নাম লেখা, নারীর

প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন কার্জক্রম গ্রহণ ইত্যাদির প্রচলন শুরু করেছেন। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ থেকে ৫০ করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন কাউন্সিল, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা হয়েছে। 'যৌতুক বিরোধ আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, ২০১৬', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড', এবং 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ২০১৮' -এ ভূষিত হয়েছেন (নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, পৃ. ৩৪)। কিন্তু, এসকল কার্যক্রমে পাঠক্রম পরিবর্তন বা সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করার কোন উপকরণ অন্তর্ভূক্ত নেই যা যেকোন কাঠামোগত পরিবর্তন মানসিকভাবে গ্রহণ ও স্থায়ী করানোর জন্য প্রয়োজন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

গির্ট হবস্টিড ১৯৬০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ৭৬টি দেশের সামাজিক সংস্কৃতি তথা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করে একটি সাংস্কৃতিক মাত্রার তত্ত্ব গঠন করেন যা Hofstede's Cultural Dimensions Theory নামে পরিচিত। সেখানে তিনি সমাজের ৬ ধরনের প্রকৃতি বা গঠনতন্ত্র নির্ধারণ করেনঃ ১। ক্ষমতার ব্যবধান সূচক (Power Distance Index)-এ সমাজের অবস্থান, ২। ব্যক্তিবাদ বনাম সমষ্টিবাদ (Individualism vs. Collectivism), ৩। অনিশ্চয়তা পরিহার সূচক (Uncertainty Avoidance), ৪। পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব (Masculinity vs. Femininity), ৫। দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন বনাম স্বল্পমেয়াদী অভিযোজন (Long-term Orientation vs. Short-term Orientation), এবং ৬। ইচ্ছাপূরণ বনাম সংযম (Indulgence vs. Restraint)। এখানে পুরুষত্ব দ্বারা সে সমাজের কথা বলা হয়েছে যেখানে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সাফল্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, এবং তার জন্য থাকে বস্তুগত পুরস্কার। বিপরীতে নারীরা সহযোগিতা, বিনয়, দূর্বলের প্রতি যত্ন ও জীবনমানের প্রতি উদ্বেগ প্রদর্শন করবে। তার মানে এ ধরণের সমাজে নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে বিনয়ী ও যত্নশীল হয় সে সমাজে নারীত্বের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। (Hobstede, 1994)। এই প্রবন্ধটিতে শুধু সমাজের পুরুষত্ব বনাম নারীত্ব প্রকৃতির একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জৈবিক দিক থেকে নারী-পুরুষের মাঝে যেসকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা সারাবিশ্ব জুড়ে একইরকম। কিন্তু, তাদের সামাজিক পরিচয়, চরিত্র বা ভূমিকা জৈবিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়না। এন কনস্টান্টিনোপল (১৯৭৩) পুরুষত্ব ও নারীত্ব-এর প্রচলিত ধারণার তিনটি কেন্দ্রীয় দিক উপস্থাপন করেন, যথাঃ ভূমিকা গ্রহণে লিঙ্গ (Gender-role adoption), ভূমিকা অগ্রাধিকারে লিঙ্গ (Gender-role preference) এবং ভূমিকা পরিচয়ে লিঙ্গ (Gender-role

identity)। 'ভূমিকা পরিচয়ে লিঙ্গ' দ্বারা তিনি সামাজিক নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী নারী-পুরুষের লিঙ্গ ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বা প্রত্যাশিত বিভাজনের কথা বলেন (Kachel, Steffens & Niedlich, 2016)। প্রত্যেক সমাজই নারী বা পুরুষের উপর্যুক্ততা চিন্তা করে কিছু আচরণকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু কোন আচরণ কাদের জন্য প্রযোজ্য তা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে আলাদা হয়ে থাকে। হবস্টিডের 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তত্ত্ব' অনুযায়ী যে সমাজ কৃতিত্ব, বীরত্ব, দৃঢ়তা, এবং সাফল্যে পার্থিব প্রতিদান বা পুরষ্কারের উপর জোড় দেয় তা পুরুষত্ববাদের সমাজ। এখানে নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা ভূমিকা পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে, এ ধরণের সমাজ প্রতিযোগিতামূলক। অন্যদিকে, যে সমাজ সহযোগিতা, শালীনতা, দুর্বলের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং জীবন-মানের প্রতি অগ্রাধিকার দেয় তা নারীত্ববাদের সমাজ। এখানে নারী-পুরুষের একই ধরনের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বৃহত্তরভাবে, এ সমাজব্যবস্থা ঐকমত্য ভিত্তিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নারীত্ববাদের সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস কম হয়ে থাকে কেননা সবাই জীবনমানের প্রতি মূল্য দেয়। কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানকে মনুষ্যত্বপূর্ণ করে তোলে। ব্যবস্থাপকগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে আলোচনা এবং সমঝোতাকে মূল্যায়ন করা হয়। অভ্যন্তরে সমতা নিশ্চিত করতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে সহায়তা করা হয়। সমাজে নারীদের স্বাধীনতা বলতে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান ভাগ বা অংশগ্রহণকে বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের বিপুল অংশগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, ইত্যাদি দেশগুলোতে নারীত্ববাদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় (Hobstede, 1994)। স্বভাবতই, এখানে শিশুরা একটি বিনয়ী এবং সংহত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে (Dutta & Islam, 2016)। কেননা, তারা পারিবারিক সংস্কৃতিতে পিতা-মাতাকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে দেখতে পায়। ছেলে-মেয়ে উভয়কেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়। এটি বিদ্যালয়েও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই নিজেদের মেধা জাহির করার বা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে না। শিক্ষকরা বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা শেখানোর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে থাকেন (Hobstede, 1994)। সর্বোপরি, সাম্য বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাব দেখতে পাওয়া যেতে পারে যেখানে দেশের উন্নয়নে সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

নারীত্ব বা ফেমিনিনিটি কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রতিরূপ

একটি দেশের প্রেক্ষাপটে "উন্নয়ন"-কে ইতিবাচক পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশেষত, উন্নয়ন দ্বারা পূর্ববর্তী বা বর্ণিত পরিস্থিতি থেকে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বোঝায় যা

দ্বারা সমাজ ও পরিবেশের উপর কোনও খারাপ প্রভাব পড়বে না। সংজ্ঞায় বলা যায়, উন্নয়ন হ'ল এমন একটি প্রক্রিয়া যা বৃদ্ধি, অগ্রগতি, ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় বা ভৌত, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মাঝে নতুন কিছু সংযোজন করে (SID, 2018)। সাধারণভাবে, উন্নয়নের সকল ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের ২০টি সূচক নির্ধারণ করেছে যা দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের স্বরূপ বোঝা যায়, যথাঃ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, এইড বা আর্থিক সহযোগিতার কার্যকারিতা, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, শক্তি ও খনন, পরিবেশ, বহিঃদেনা/ ঋণ, আর্থিকখাত, লিঙ্গ/ জেন্ডার, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, শ্রম ও সামাজিকসুরক্ষা, দারিদ্র্য, ব্যক্তিগত খাত, সরকারি খাত, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সামাজিক উন্নয়ন, বাণিজ্য এবং নগর উন্নয়ন।

উন্নয়নের সূচক সমূহ কোনটিই নারী উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্জনের কথা ভাবা যায়না। বিশেষকরে, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়নের জন্য লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের সাথে সংপৃক্ত উন্নয়নের ৫টি খাত সুনির্দিস্ট করা যেতে পারে, যথাঃ ১. শিক্ষা, ২. লিঙ্গ/জেন্ডার, ৩. শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা, ৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ও ৫. সামাজিক উন্নয়ন। এসকল সূচক খুব সহজেই নারীত্ব সমাজ ব্যবস্থায় অর্জন করা সম্ভব, যেমনঃ একজন মানব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সাথে তার পরিবার ও বিদ্যালয় জড়িত থাকে। শিশু যখন তার বাবা-মায়ের কাজে সমতা দেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ দেখে তখন সে নারী-পুরুষের সমতার শিক্ষাই পাবে। বিদ্যালয় পারিবারিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুশীলন করার একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে ছেলে-মেয়েরা একই জাতীয় ব্যবহার পেয়ে তারা নিজেদের সমান মনে করে, এবং অনুরূপভাবে পারস্পারিক সহযোগিতার শিক্ষা গ্রহণ করে। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজে লিঙ্গ/জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হয়। সমাজ নারী-পুরুষ সম্পর্কের উর্দ্ধে যেয়ে পিছিয়ে পরা বা সুবিধাবঞ্চিত দলের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে থাকে। অন্যদিকে, পুরো সমাজ নারী-পুরুষের ভূমিকায় সমতা বজায় রাখে বলে কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে নারীর উপর কোনরূপ নির্যাতন করতে সুযোগ পায় না। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ বিশেষত সমাজতন্ত্র বা সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। বিধায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রম বিভাজন হয় এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্র সকলের সমান মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ ও ব্যস্তবায়ন করে থাকে। একটি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে রাষ্ট্র তথা সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের সাথে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্র প্রধানদের সুসম্পর্ক উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ও বিকাশ। তাই, নারীত্ব কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের বিকাশ সহজ ও দ্রুততর হয়।

আলোচ্য সকল বিষয় নিশ্চিত হয়েই নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ তথা রাষ্ট্রে সার্বিকভাবে সামাজিক

উন্নয়ন বিরাজ করে। কেননা, সমাজের যেকোন একটি অংশকে পিছিয়ে রেখে বা সুবিধা বঞ্চিত রেখে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, এ সমাজ ব্যবস্থা ঐকমত্যের ভিত্তিতে চলে বলে গণতান্ত্রিক দেশেও নারীত্ববাদের সুফল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী নির্যাতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। নির্দিষ্টভাবে, ধর্ষণের হার বাড়ার কারণে সাধারণ জনগণ রাজপথে সমাবেশ করছে। ইন্টারনেট ব্যবহার সহজতর হওয়ার কারণে বর্তমানে নারী নির্যাতনের (যেমনঃ সংখ্যালঘু নারীর উপর আক্রমণ) ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ঘটনা ঘটছে। প্রতিবাদে লিপ্ত দলগুলো মূলত ধর্ষক বা নির্যাতনকারীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন করছে (The Daily Star, 2020)। স্থানীয় মানবধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর তথ্য মতে, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০-এর মধ্যে প্রায় ১০০০ ধর্ষণের ঘটনা তালিকাভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ২০৮টি গণধর্ষণের ঘটনা রয়েছে (AlJazeera, 2020)।

বস্তুত, বাংলাদেশে সামাজিক সংস্কৃতিতে নারীরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছিয়ে আছে। জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ সমান হলেও উচ্চশিক্ষায় বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমান অংশগ্রহণ পাওয়া যায় না। তাই, নারীদের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য বাংলাদেশে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা মানেই নারী সমাজে তার স্বকীয়তার মর্যাদা পাবে। যদিও, নারীত্ব সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা বাংলাদেশের জন্য সহজ কোন ব্যাপার নয় তবে উন্নত সমাজের উদাহরণকে সামনে রেখে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। উন্নত সমাজের সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলি অনুসরণ করে এখানে সরকার তার নীতি নির্ধারণ করতে পারে। একটি দেশের সংস্কৃতি সেখানে বসবাসকৃত মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং তার সামাজিক রূপ, অনুশীলন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। মানুষ বা সমাজের মতই সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। উন্নয়ন আনতে মাঝে মাঝে একটি সমাজ তথা দেশ অন্য সমাজের সংস্কৃতি অনুসরণ অথবা গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় সিনেমা এবং টিভি সিরিয়াল বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়, যার মাধ্যমে একটি দেশের সংস্কৃতি আরেকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রভাব বিস্তার করছে। এ পরিবর্তনের ধারাকে ব্যবহার করেই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীত্ব গ্রহণ করতে হবে। এখানে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থা একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সুইডেনের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগকে সমর্থন করে। সেখানে প্রত্যেকের কাজ-পেশা এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা

হয়। সকলের জন্য নির্যাতন বা সহিংসতার ভয় ছাড়াই বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীত্ববাদ মানে শুধু নারী ও পুরুষদের মাঝে সমান বণ্টনই নয়, উভয়ের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রগতি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় (Sweden Sverige 2018)। এই বিষয়গুলো প্রচারে দেশের অভ্যন্তরে মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাটিকা, বিজ্ঞাপন, সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল সম্প্রচারের মাধ্যমে নারীত্ববাদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করা যায়। সমকালীন কিশোর সাহিত্যে মুহম্মদ জাফর ইকবাল অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী মেয়ে/নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচনা করছেন। এটি কিশোরদের মাঝে মেয়েদের অবজ্ঞা না করার মানসিকতা তৈরি করবে। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য প্রচারের জন্য সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। সরকারি সকল কার্যালয়ে নারীত্ব কেন্দ্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যাতে সকলে তা অনুসরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা এবং মেয়াদ দুটোই বেড়েছে (সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীতে ৫০টি আসন, ২৫ বছর মেয়াদ)। কিন্তু, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সংরক্ষিত আসন নয় প্রয়োজন সাধারণ আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারার অনুকূল পরিবেশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে কেননা, নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা সহজতর। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে নমনীয়, বিনয়ী এবং সুগ্রাহী করে গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়াও সহজতর হবে। এভাবে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। অন্যদিকে, নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা সহজ হয়। তাই, সরকারের উচিত হবে শুধু নারীদের সুবিধা বাড়িয়ে নয় বরং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তলার জন্য দেশের জনগণের সামনে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা।

উপসংহার

বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত একটি দেশের পথে যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে তা বিশ্বের বুকে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 'মানবসম্পদ উন্নয়ন' সে যাত্রাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সে মানবসম্পদের অর্ধেক অংশ নারী। সুতরাং নারীকে বাদ দিয়ে দেশের কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা নারীর অংশগ্রহণে উন্নয়ন ত্বরান্বিত, টেকসই ও দ্রুততর হওয়ার প্রক্রিয়া প্রকাশ করছে। কিন্তু, কিছু আর্থিক স্বাধীনতা নারীরা ভোগ করতে পারলেও সামাজিক পদমর্যাদায় নারী এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। রাষ্ট্রীয় সকল কার্যে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সামাজিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও

অবস্থানের পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে পরিবর্তন নিশ্চিত করতে "নারীত্ব" তত্ত্বাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিবার থেকে নারীত্ব কেন্দ্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন ধীরে ধীরে নারীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তাই, নারীর সামাজিক পদমর্যাদা, যা কিনা একজন নারীর জীবন প্রস্ফুটিত করার প্রাথমিক ভিত্তি, তথা সমমর্যাদা বৃদ্ধিতে নারীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সকলকে আত্মস্থ করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Flash Eurobarometer 372, 2013, 'Women in Developing Countries', European Commission.

২। ইসলাম, সিরাজুল, ২০১৪, 'দাসপ্রথা', বাংলাপেডিয়া (অনলাইন), প্রাপ্যতাঃ http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%BE, তারিখঃ ২৬.০৪.২০২১।

৩। Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M., 2010 (Third Edition), Cultures & Organizations: Software of the Mind, New York: The McGraw Hill Companies.

৪। সেনগুপ্ত, অবিনাশ, ২০১৫, 'উনিশ শতকে ভারতীয় নারীঃ সমাজ, সংস্কার ও উপনিবেশ', বিদ্যাসাগর (অনলাইন), পৃঃ১-৬, প্রাপ্যতাঃ http://inet.vidyasagar.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1847/1/10%20Unish%20Shatake%20Bharatiya%20Naari.pdf, তারিখঃ ১২.০৯.২০২০।

৫। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সম্পাদক), ২০১৭, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: বেগম রোকেয়া, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।

৬। আহমেদ, ইয়াসমিন, ও বর্মণ, রাখী, ২০০৯, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

৭। মুন্নী, আক্তার, ২০২১, 'নারী দিবসঃ নারীবাদীদের এতো নেতিবাচকভাবে দেখা হয় কেন বাংলাদেশে?', BBC News বাংলা (অনলাইন), ৮ মার্চ, প্রাপ্যতা: https://www.bbc.com/bengali/news-56314611, তারিখ: ০৬.০৮.২০২১

৮। Moudud, B., 2011, 'নারী উন্নয়ন নীতি: নারীর ভাগ্যজয়ের চাবিকাঠি / Women's Development Policy: The key to women's destiny', bdnews24.com (অনলাইন), 4 April, প্রাপ্যতা:

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/2581, তারিখ: ৩১.০৩.২০২০

৯। Chant, S. & Sweetman, C., 2012, 'Fixing women or fixing the world? Smart economics: efficiency approaches, and gender equality in development', Gender & Development, vol. 20, no. 3, pp. 517–529.

১০। Khair, R., Haque, S. & Mukta, A., 'Gender and Representation of Women in Bangladesh Civil Service: An Empirical Analysis of 'Glass Ceiling' Effect' (Research Report), প্রাপ্যতাঃ http://www.bpatc.org.bd/images/document/159_Glass_Ceiling_Research_Report_Draft.pdf, তারিখঃ ২৭.০৪.২০২১

১১। হোসেন, সেলিনা, ২০২১, 'নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা' (অনলাইন), পৃঃ ২-৫, প্রাপ্যতাঃ http://www.bpatc.org.bd/images/document/412_NariUnnoyoneBongobondhurVabna.pdf, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২১

১২। নাজমীন, সুলতানা, ২০১৪, 'বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থাণীয়স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ' (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৩। মাহমুদ, ফারজানা, ২০১৯, 'নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ', বাংলা ট্রিবিউন (অনলাইন), ২৮ সেপ্টেম্বর, প্রাপ্যতাঃ https://www.banglatribune.com/556565/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6, তারিখঃ ০৯.০৮.২০২১

১৪। General Economic Division (GED), 2015, 'Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015', Government of the People's Republic of Bangladesh, p.43.

১৫। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৮, 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮', পৃ. ৩৪।

১৬। Kachel, Sven, Steffens, Melanie C. and Niedlich, Claudia, 2016, 'Traditional Masculinity and Femininity: Validation of a New Scale Assessing Gender Roles', Frontiers in Psychology (অনলাইন), প্রাপ্যতাঃ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00956/full, তারিখঃ ১০.০৮.২০২১

১৭। Hofstede, G., 1994, Cultures & organizations: Software of Mind, Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, New York: Harper Collins Publishers.

১৮। Dutta, B. & Islam, M., 2016, 'Role of Culture in Decision Making Process in Bangladesh: An Analysis from the Four Cultural Dimensions of Hofstede', Bangladesh e-Journal of Sociology, vol. 13, no. 2, pp. 30-38.

১৯। Sid Israel, 2018, 'Development', প্রাপ্যতাঃ https://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development, তারিখঃ ২২.০৯.২০২০।

২০। The Daily Star 2020, Anti-rape protect continues for seventh consecutive day, 12 October.

২১। AlJazeera 2020 (online), Bangladesh rocked by fresh protests over sexual assults, 6 October, প্রাপ্যতাঃ https://www.aljazeera.com/news/2020/10/6/bangladesh-rocked-by-fresh-protests-over-sexual-assaults, তারিখঃ ২৮.০৪.২০২১

২২। Sweden Sverige, 2018, 'Gender equality in Sweden', প্রাপ্যতাঃ https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/, তারিখঃ ২০.০৩.২০১৮

সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া' মতবাদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

নিরূপা ভৌমিক[১] এবং ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম[২]

Abstract

Ibn Khaldun was a scholar of history, philosophy and politics and the best social scientist among those in his contemporary era. His social solidarity i.e. Asabiyah was the most important concept in developing the social harmony and philosophy of state. This concept helped developing the harmonious relationship among people during that time. Among the concepts having great contribution in building the society and state 'Asabiya' is considered as one of the powerful concepts having direct contribution. Society becomes stronger because of kinship that binds them together. The religious beliefs, nomrs, practices, customs strengthens bonding among the groups and creates harmony, particularly among the big groups. On the other hand, small groups become stronger for their survival. This is the process of 'Asabiya' that helps building the society. It still works in shaping and transforming the society and state. Different stages of formation of state identified by Ibn Khaldun dicate the transformational and development process of today's society, state and people in power. This paper has an objective of analyzing the relationship how this concept helps building the state and society.

Keywords: Asabiya, Khaldun, Society, State, transformation

ভূমিকা

আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র কোন একটি ঘটনার মাধ্যমে রাতারাতি গড়ে উঠা কোন সংগঠন নয় । বরং শত শত বছরের বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের মতবাদের ভিত্তিতে এবং সমাজ বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে গড়ে উঠা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র বিবেচিত হয়ে আসছে। যেহেতু রাষ্ট্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে,

১ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা , উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বিজয়নগর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া। ই-মেইল: nirupabhowmik@gmail.com

২ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। ই-মেইল: rezapatc@gmail.com

সেহেতু সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী রাষ্ট্র ও তার অন্যতম উপাদান 'সংহতি' যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইবনে খালদুন এই সংহতিকে ও 'আসাবিয়া' বলেছেন যা 'আসাবিয়াত' নামেও পরিচিত । তাত্ত্বিক দিক থেকে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে যেসব খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে তাঁদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। মধ্যযুগের যেসব সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন অন্যতম এবং তাঁর আসাবিয়া মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ এক মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে (Spittler, ২০০৮) । এ প্রবন্ধে আসাবিয়া মতবাদ কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে ।

ইবনে খালদুন এবং আসাবিয়া

আরব ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন আরব দেশ ও স্পেনে বিভিন্ন পদে চাকরি করে কর্মজীবনে অতিবাহিত করেন। আইন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য এবং আগ্রহের কারণে কর্মজীবনে তার উত্থান ছিল লক্ষণীয়। ইবনে খালদুন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে গণ্য হন। বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ 'কিতাবল ইবাবন' তাঁর মহান কীর্তি। তিন খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড 'মুকাদ্দামা' (ভূমিকা) তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। মুকাদ্দামায় তিনি ইতিহাস সম্পর্কিত মতবাদ বর্ণনার সাথে সমাজ কাঠামোর মূল উপাদান হিসেবে আসাবিয়াত বা সামাজিক সংগতির কথা বর্ণনা করেন। পন্ডিতরা মুকাদ্দামাকে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক রচনা বলে গণ্য করেন এবং এরই ভিত্তিতেই সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)।

সংহতি বা সামাজিক সংহতির উৎপত্তি

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের বিস্তৃতি লাভে ইবনে খালদুনের যে ধারণা বা প্রত্যয়টি সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে সেটি হল আল আসাবিয়া বা সামাজিক সংহতি। তাঁর মতে সমাজ কাঠামোর মঙ্গল উপাদান হলো সামাজিক সংহতি বা গোষ্ঠী চেতনা (Gierer, ২০০১; Wajdi dusuki, ২০০৬)। সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনা করতে গিয়ে হব্‌স্ বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রযুক্তি ক্রিয়াশীল (Mouritz, ২০১০)। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ তাদেরও যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার তৃতীয় কোন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিমন্ডলীর হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করে দেয়। হব্‌সের মতে এটাই হচ্ছে সামাজিক চুক্তি এবং এই চুক্তি রাষ্ট্র বা কমনওয়েলথের অন্তর্নিহিত ঐক্যের মূল উৎস। চুক্তির মাধ্যমে যে ব্যক্তির বা ব্যক্তি সংস্থার হাতে যাবতীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংস্থা হচ্ছে সার্বভৌম।

খালদুন অবশ্য হব্‌স্‌ থেকে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, সমাজের সকল মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত নয়। তাঁর মতে, কিছু সংখ্যক মানুষ ঈশ্বর প্রদত্তভাবে অন্য সকল মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট। খালদুনের সমাজের অন্য সকল মানুষ যখন ঐ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে তখনই সৃষ্টি হয় আসাবিয়াত বা সংহতি। তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের প্রতি মানুষের আস্থার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থানের জন্য খালদুনের তত্ত্ব অনেক বেশি গঠনমূলক ও স্থায়ী।

আসাবিয়াত বা সংহতি বা সামাজিক সংহতি কী?

ইবনে খালদুনের আসাবিয়াতের ধারণার ভিত্তিতেই ইতিহাস সম্পর্ক ব্যাখ্যা দান এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে আসাবিয়াতই মানব সমাজের মেলবন্ধন এবং ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি। কারণ সমাজ, রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত আসাবিয়াতের সৃষ্টি। সংহতির ব্যাখ্যায় খালদুন বলেন যে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বাঁচার তাগিদে প্রয়োজন একটা সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা তথা সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে মানুষ তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক গঠনের কারণে একা বাস করতে পারে না। তাকে জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা স্থাপন করতে হয় (Gaksu, ২০০৭; Wajdi dusuki, ২০০৬) । পারস্পারিক সহযোগিতার অবশ্যাম্ভাবিতাই সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি যা আসাবিয়াতেরও মূল বিষয়।

খালদুনের অভিমত হচ্ছে, মানুষকে জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধভাবে বসাবাস করতে হয়। আর এভাবেই যৌথ বা সমবেত জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এরূপ যৌথ জীবনের সমষ্টিগত চেতনাবোধ ধাপে ধাপে সভ্যতার বা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের উত্তরণ। ইবনে খালদুনের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের বিষয়বস্তুই হলো এ সভ্যতা বা সংস্কৃতি। অর্থাৎ বেঁচে থাকার তাগিতেই মানুষের মাঝে সংহতির সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমে তা সামাজিক বন্ধনে রূপদান করে।

সংহতির উপাদানসমূহ

জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন অবলম্বনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্রতার মূলে কাজ করে গোষ্ঠী চেতনা। খালদুনের মতে গোষ্ঠী চেতনা ও সামাজিক সংহতির উন্নয়ন এবং টিকে রাখার জন্য যে উপাদানগুলো অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো আত্মীয়তা ও রক্ত-সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক, ধর্ম, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও শ্রম বিভাজন

(ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। এসব উপদানের মধ্যে গভীর আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে যা মানুষ এক ঐক্যবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে একত্র করেছে। এসব উপাদান কীভাবে সামাজিক সংহতি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করা হলো:

• আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক

খালদুনের মতে সমাজ সংহতি রক্তসমপর্ক, আত্মীয়তার ভিত্তিতে অথবা তৎসাদৃশ্য কোন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল (আল-মোকাদ্দিমা, পৃ৫১, Gierer, ২০০১)। রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের উপর এমনই একটা ভাবাপ্লুত মানসিক প্রভাব বিস্তার করে যে, এর ফলে দুই ব্যক্তি যারা রক্ত-আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত পরস্পরেক সর্বান্তকরণে সাহায্য করে ও একান্ত আপন হয়ে যায়। রক্ত সম্পর্কের ফলে ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মীয়তার বোধ জন্মে তা সমাজ ও সংহতির পাথেয় হয়ে দাড়ায় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। রক্ত -আত্মীয়তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সমপ্রদায় ও সমাজকে ঐকবদ্ধ করে। রক্ত-আত্মীয়তা প্রথমত ব্যক্তির প্রয়োজনে এগিয়ে আসে যা সমাজের উন্নয়নে সহযোগিতা করে।

• বন্ধুত্ব

সংহতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব হচ্ছে সমমনা, একই চিন্তা, ধ্যান-ধারণার মানুষের আত্মিক যোগাযোগ। একথা বলাই বাহুল্য যে, বন্ধুবান্ধব, অধীন ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে সমাজে সংহতির সৃষ্টি হয়; সমাজ আরও শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমাজে সাধারণত সমবয়সী, একই রকম মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি, একই মতবাদে বিশ্বাসী, একই রকম শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে (করিম,২০০৯; Gierer, ২০০১)। সাধারণত একই রকম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বন্ধুত্ব আরও মজবুত হয় এবং সমাজে সংহতি আরও দৃঢ় হয়। বন্ধুত্বের মনস্তাত্বিক নৈকট্যের কারণে সংহতির মাত্রাও তীব্রতা লাভ করে। লক্ষণীয়, যে সমাজে মানুষের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যত ভালো সে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা তত স্থিতিশীল। অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষার জন্য বন্ধুত্ব অনুষঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ পালন করে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও আমরা দেখতে পাই যে যাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তারাই একে অপরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করছে; গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংগঠন যার মূল উদ্দেশ্য দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের উন্নয়নে অংশীদারী হওয়া।

• ধর্ম

একই ধর্ম দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির নিয়ামক। একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মের বন্ধন এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও ঐক্য বা সামগ্রিক সংহতি সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। ধর্ম একটি প্রাচীন

প্রতিষ্ঠান যার মনস্তাত্বিক, সামাজিক, আর্থনীতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মীয় রীতিনীতি মানব সভ্যতার শান্তি শৃঙখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী অনুসঙ্গ। ধর্মীয় মুল্যবোধ পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধ্বে মানুষের কল্যাণে কাজ করার এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব তৈরীতে সাহায্য করে থাকে। যার ফলশ্রুতি সমাজে শান্তি সংহতি প্রতিষ্ঠা (Gierer, ২০০১)। আজকের বাস্তবতায়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি বড় বিষয় হিসেবে ধর্মকে দেখতে পাই। এর ফলেই গড়ে উঠেছে নতুন নতুন সংগঠন এবং আঞ্চলিক মোর্চা। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার জন্য যেমন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) গড়ে উঠেছে তেমনি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশগুলোও তাদের ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি দৃঢ় করেছে। ভারতের সাথে নেপাল ও ভুটানের সম্পর্ক ভৌগোলিক অবস্থানগত দিকের পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান আরও বেশি শক্তিশালী করেছে।

• ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী

খালদুন বলেন যে, গোষ্ঠীর সমাজেই সমাজ সংহতিমূলক বন্ধনের আধিক্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বেদুইন ও যাযাবরদের জীবনে রক্ত-আত্মীয়তা গভীরভাবে বিদ্যমান। যাযাবর জীবনে তারা পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। তাদেরও প্রত্যেকেই একই ধরণের কঠোর, সংগ্রামশীল ও প্রাচুর্যবিহীন জীবনভঙ্গি দ্বারা লালিত হতে হয় বলে সব সময়ই তারা রক্ত আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল। মরুভূমির দারিদ্র্য যাযাবরকে আপন ভূমিতে স্থায়ী করে রাখতে পারেনি। জীবিকার তাগিদে এদেরকে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যেতে হয়েছে। ফলে সব দেশই তাদের কাছে সমানভাবে প্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে (Gierer, ২০০১)। অভিন্ন জীবন-যাপনের পদ্ধতি তাদেরকে পুরুষোচিত, কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে। শান্তি ও আরাম আয়েশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বিরাট জনগোষ্ঠীর সাথে এদের প্রায়শ যুদ্ধ বেঁধেছে। যুদ্ধে যাযাবরই জয়ী হয়েছে যা সমাজ-সংহতিকে আরও দৃঢ়তর করেছে। এই জয় তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে হেরে যাওয়ার শিক্ষা বিজিত দলকেও আরও সংঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছে।

• শ্রম বিভাগ

সমাজ, সভ্যতা এবং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনে শ্রমবিভাগ আর্থনীতিক প্রক্রিয়াকে গতিশীলতা দানের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের মাঝে কাজ ভাগ করে দেয়ার পদ্ধতিই শ্রম বিভাগ (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। শ্রমবিভাগ সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ করতে বাধ্য করে এবং পরস্পরকে নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

পারস্পারিক এই নির্ভরশীলতাবোধ সংহতির জন্ম দেয়। আবার সংহতির কারণে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা আরও বেশি শক্তিশালী করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এইসব বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে, ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে দৃঢ় করে। সংহতির মাধ্যমে গড়ে উঠা শ্রম-বিভাগের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্র গঠনেরও হাতিয়ার। অনেক ক্ষেত্রে আসাবিয়া ন্যায়সঙ্গত আইনের চেয়ে ভাল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করে। যার স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক

ইবনে খালদুন মনে করেন সমাজ ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গাঁথা। সমাজের সাথে রাষ্ট্র, বস্তুর সাথে বস্তুর আকারের ন্যায় সম্বন্ধের ন্যায় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই দুটিকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সমাজের বাইরে যেমন কোন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি আইন-কানুন বর্জিত, শৃঙ্খলাবিহীন কোন সমাজও টিকে থাকতে পারে না (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন। রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা, সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক স্থিতিশীলতা যার মুল ভিত্তি হচ্ছে সংহতি। সংহতি এমন এক আনুপাতিক অদৃশ্য সম্পর্ক যার মাধ্যমে সমাজের নানাবিধ অনুষঙ্গ একত্রিত হয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, আবার রাষ্ট্রের কাঠামোকে আরও বেশি শক্তিশালী করে। একথা অনস্বীকার্য যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধ সমাজ প্রয়োজন যা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রের জন্ম

প্রাথমিক স্তরে রক্ত-সম্পর্কের সূত্রে গঠিত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তার খালদুন আসাবিয়া ব্যবহার করেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে খালদুনের ব্যাখ্যা যা আমরা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ বলে ধরে নিতে পারি তবে তা তাঁর সমাজ চিন্তা হতে পৃথক কোন চিন্তা নয়। তিনি বৃহৎ সমাজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজের রাজনেতিক কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রাজনীতির জন্য কোন পৃথক বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়াসী হননি। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা-চেতনায় মূলত সমাজ-বিনির্মাণ এবং সামাজিক সংহতির মাধ্যমে সমাজের শক্তিশালীকরণ দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর নিকট রাষ্ট্র আর সমাজ একই সুত্রে গাথা। খালদুনের মতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উদ্ভবের পেছনেও এক জাতীয় সংহতি ক্রিয়াশীল। খালদুন দেখিয়েছেন মরুভুমির যাযাবর জীবনে সার্বভৌমত্বের বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে প্রধান নেতার মাঝে। এমতাবস্থায় ক্ষমতার উৎস হচেছ পবিত্র কোন বিষয় বা নৈতিক উপাদান । রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে সংহতি কীভাবে কাজ করে তাই তিনি বিভিন্ন উদাহরণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। উপজাতীদের দ্বারা নগর বা

শহর পদানত করার মাধ্যমেই একটি সভ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠে। একজন নেতার বড় জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। সামাজিক স্থিতির লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে একটি বড় পরিসর যা রাষ্ট্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে।

নগর বা শহর উপজাতিদের হাতে পদানত হওয়ার কারণ হচ্ছে উপজাতিরা বেশি সংহত (Gaksu, ২০০৭)। যেই মুহূর্তে একটি সভ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠলো সেই মুহূর্তে থেকে রাষ্ট্র স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রগতি, পরিপক্কতা ও ধ্বংস এই স্তর অনুসরণ করে চলে। অন্য কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি বা শক্তি বাহির হতে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মাত্রাকে ব্যাহত করলে রাষ্ট্র অবশ্যই পাঁচটি সুনির্দিষ্ট স্তর ভুখন্ড-বিজয়-সাম্রাজ্য-গঠন-সর্বোচ্চস্তর আরোহন-শক্তিহ্রাস-পতন অনুসরণ করে চলে এবং প্রত্যেকটি স্তর নিজ স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমান এবং রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতার পথে ভূমিকা প্রদানকারী অনুষঙ্গ।

০১. রাষ্ট্র সত্তার ভিত্তি

প্রাথমিক স্তর রক্ত সম্পর্কের সুত্রে গঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় তাই কালান্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। যুগ পরিক্রমায় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় পরস্পরের মধ্যে নানান কারণে দ্বন্দ্ব কলহ দেখা দেয়। যে সম্প্রদায়ের অধিকতর শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ তারাই অপরাপর দুর্বল ও পরাজিত সম্প্রদায়সমূহের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রবল পরাক্রমশীল যাযাবর সম্প্রদায় প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠে। প্রচুর সম্পদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরীর আবশ্যকতা সৃষ্টি করে। তারপর তারা ধীরে ধীরে এক সময় নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করে স্থায়ী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট ভূখন্ডে, বন্ধুত্বভাবাপন্ন একই রকম বড় সংখ্যক মানুষের স্থায়ী বসবাসের মাধ্যমেই এভাবে রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। আর ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। এটি শাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় মাধ্যম। তবে এই ক্ষমতারও একটি সীমাবদ্ধতা আছে। একটি বিশেষ ধাপ পর্যন্ত এর যাত্রা তারপর আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতার দরুন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যপ্তি একটি নির্দিষ্ট স্থলে এসে থেমে যায়। গোষ্ঠীর শাসন-ব্যবস্থার যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অধীনে রাখতে পারে রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ততদুর পর্যন্ত বর্ধিত থাকে।

০২. ক্ষমতার একত্রীকরণ

দ্বিতীয় স্তর হচেছ ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করার পালা। সাধারণ সংহতির উপর নির্ভর করে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর শাসকগণ ক্ষমতা একচেটিয়া করার কাজে নিয়োজিত থাকে। সাধারণ নিয়মে ক্ষমতার মোহ এবং ক্ষমতা ব্যবহারের বাসনা মানুষের চিরন্তন। এই সময় শাসকবর্গ

তাদেরও এই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের এই স্তর হচ্ছে ক্ষমতা গুছিয়ে আনার ও চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্তর (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। এ স্তরে ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যহার দুটোই সমানভাবে লক্ষণীয়। ক্ষমতার আবর্তে সংহতি শব্দটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও কতিপয় ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য সংহতির পরিবর্তে বেতনভুক্ত সৈন্য ও সংগঠিত আমলা শাসকরাই প্রধান শক্তি হিসবে কাজ করে। এ সময়ে সামরিক বাহিনী, অর্থকোষ ও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির দলই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার প্রধান উপাদান । সমগ্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাঝে শাসকের ক্ষমতার মোহ তৃপ্ত হয় এবং এক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসে তার ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে থাকে। এ পর্যায়ে ক্ষমতার ভেট গ্রহণ শুরু হয়। ক্ষমতার একত্রীকরণের স্তরে রাষ্ট্রের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় । এখানে শাসক আর শোষিত নামে দুটি শ্রেণির উদ্ভব ও উত্তরণ ঘটে।এ পর্যায় থেকেই সমাজে শ্রেণি প্রথার উদ্ভব ঘটে এবং বিস্তার লাভ করে।

০৩. বিলাসিতা ও অবসর ভোগ

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রের বিকাশের তৃতীয় স্তর হচ্ছে বিলাসিতা ও অবসর ভোগের পর্যায় যার মূল উৎস হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ তাদের আরাম-আয়েসের জন্য মনোযোগী হতে থাকে। শাসক দেশের অর্থ ব্যবস্থা সংগঠন এবং তার আয় বৃদ্ধিও দিকে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্তকাজে এবং সভ্য রাষ্ট্রগুলোর অনুকরণে বিভিন্ন নগরের সৌন্দযবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। তিনি তার অনুসারীদের ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেন এবং তারাও বিলাসময় জীবন যাপন শুরু করেন। এ স্তরে ব্যপকভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনও শুরু হয় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২) । নতুন শাসকগোষ্ঠীর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কারিগরি চারুকলা ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে । জীবিকার স্তর থেকে বের হয়ে আসা ব্যক্তির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে গড়ে উঠা রাষ্ট্র মানুষের অফুরন্ত সময়ের প্রসার ঘটে যা তাদেরকে নান্দনিক হতে সাহায্য করে। বিলাসিতা আর অবসর ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটাতে ভূমিকা রাখে। বিলাসিতার মোড়কে অপচয়ের বাড়াবাড়ি থাকলেও সৃষ্টিশীল কাজকে উৎসাহ প্রদান করে। মধ্য যুগ থেকে শুরু নিকট অতীতে বিভিন্ন শাসনামলে গড়ে উঠা বিভিন্ন নান্দনিক স্থাপনাগুলোই সে পরিচয় বহন করে। তবে একথা সত্য যে, ভোগ ও বিলাসিতার বিষয়টি একটি শ্রেণির কাছে সীমাবদ্ধ থাকে । রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের এ স্তরে শ্রেণি বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। শাসক শ্রেণি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করে এবং ভোগ-বিলাসিতার দিকে ঝুঁকতে থাকে। অন্যদিকে শোষিত শ্রেণি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও শাসক শ্রেণির বিলাসিতায় সহযোগিতা করার পর্যায়ে উপনীত হয়। তবে এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে শাসিত শ্রেণিও আরাম-আয়েসের মধ্যে জীবন যাপনের ফুরসৎ পায়। শাসক শ্রেণি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একটি ছোট

দলের কাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত হতে থাকে । ধারণা করা যায় যে, আজকের আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব এ স্তরেই।

০৪. সন্তুষ্টির যুগ

এ স্তর হচেছ সন্তুষ্টির যুগ। এ পর্যায়ে শাসক ও শাসিত সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকেন। বিলাসিতা , আরাম-আয়েশ, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা তাদের এ অভ্যাসে পরিণত হয়। পূর্বের সংগ্রামী জীবনের চেয়ে এ পর্যায়ে তারা অনেক বেশি আরামপ্রিয় হয়ে উঠে। তারা তাদের পূবসুরীদেরও রক্ষিত বস্তুসম্পদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে । আবার অন্যদেক যেসব শক্তি তাদের সমৃদ্ধি ব্যহত করতে পারে সেসব শক্তি মোকাবিলায় তার সামর্থ্যহীনতার পরিচয়। সন্তুষ্টি ও বিলাসিতার কারণে তাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় কাজ করার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে যা নিজেদেরকে দুর্বল করে। এই দুর্বলতা ক্রমশ রাষ্ট্রের অবস্থানকে দুর্বল করে এবং সামাজিক স্থিতি ও শান্তি নষ্ট করে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র তার শক্তি হ্রাস করে ও রাষ্ট্রের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠে।

০৫. রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস এবং বিনাশ

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস ও সংহতি বিনাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়। অমিতব্যয় ও অপচয়ের পঞ্চম ও সর্বশেষ পর্যায়ের সূচনা হয়। এ পর্যায়েই শাসক তার লোভ লালসা ও সুখ আনন্দের স্বার্থে পূর্ব পুরুষদের সঞ্চয় বিনষ্ট করেন। অধিকন্তু তারা তাদের সৈন্যদের অংশবিশেষ হারান, কারণ তারা তাদের পারিশ্রমিকের অর্থ তাদের ব্যক্তিগত সুখ-আনন্দের জন্য ব্যয় করেন। শাসক শ্রেণির অমিতব্যয়িতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভোগবাদিতার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় সংকুচিত হয়। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের রাজধানীতে ভাড়াটে সৈন্য এবং বেসামরিক আমলারা শাসকের কাজ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেন এবং তিনি নামমাত্র শাসকই থাকেন । শাসক শ্রেণির ভুল ও অপরিণামদর্শিতার কারণে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং বাইরের শক্তিশালী দল রাষ্ট্র দখলের সুযোগ নেয়। শেষ পর্যন্ত বাইরের আক্রমণকারী রাষ্ট্রের জীবনাবসান ঘটায় বা তৈলশুন্য প্রদীপের নিবন্ত সলতের মত বিলুপ্ত না যাওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের পতন ঘটতে থাকে। দৃশ্যত রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণির অবচয়, ভোগ-বাদিতার জন্যই রাষ্ট্রের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠে।

খালদুনের এই চক্রাকার ব্যখ্যা পরবর্তীকালে বহু সমাজতত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তাকে প্রভাবিত করেছে বললে ভুল হবে না। কেননা পরবর্তীকালে বহু ইতিহাসবেত্তা ও সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিবর্তনকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখেছেন।

Oswald Spengler এর The Decline of the West গ্রন্থে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টয়েনবির ইতিহাস দর্শন এবং তাঁর সভ্যতার ইতিহাস লেখায় এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, কার্যকারিতা ও পরবর্তী সময়ে ধ্বংস ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের মাঝে একটি দার্শনিক রীতি প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা খালদুন করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আধুনিক সমাজ এবং আসাবিয়া

ইবনে খালদুনের আসাবিয়া মতবাদ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। আসাবিয়ার মুল উপাদান হচেছ আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, শ্রম বিভাজন। এই সব উপদান আধুনিক সমাজ গঠন, বৃদ্ধি, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো সর্বপোরি সমাজে শান্তি-শৃঙখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আত্মীয়তা এবং রক্ত সম্পর্ক সমাজে সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি প্রধান অনুষঙ্গ। একটি গ্রাম বা পাড়ার নিজস্ব আত্মীয় স্বজন যত বেশি তাদের মধ্যকার সম্পর্ক তত বেশি ঘনিষ্ঠ (Bukhari, ২০১০; Haller, 2009; সেন Ges bv_, 2005)। যদিও আধুনিক সমাজের নেতিবাচক কিছু দিক বা ক্ষমতার অংশীদারিত্বের জন্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মারামারি হানাহানি একেবারে কম নয়। তবে মানসিক নৈকট্য বা মানবিক দুর্বলতার জন্য রক্ত সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গঠনে অনস্বীকার্য। সমাজে লক্ষণীয় যে, যে পরিবার জনবল এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে তারাই সমাজের মূল ক্ষমতা ভোগ করে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। একইভাবে ধর্ম একটি প্রাচীন সংঘঠন এবং এর ভিত্তিতেই আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে (Haller, ২০০৯)। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান একটি সমাজের সীমানা নির্ধারণ করে। এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। একটি ধর্ম সেই সমাজের রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি রাষ্ট্রেরও। আপাতদৃষ্টিতে সমাজের বিভাজন মনে হলেও ধর্ম একটি গোষ্ঠীকে একত্রে শান্তিপূর্ণ বসবাসের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। তবে এটা শহুরে সমাজকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। রক্ত-সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও ধর্ম একটি বড়দলকে সংঘবদ্ধ করে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এ তিনের সম্মিলন সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যা একটি মূল শ্রোতধারা তৈরি করে। তবে একটি সমাজে মুল স্রোতধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়। মূল স্রোতের রীতি নীতি যেহেতু বৃহত্তর সমাজের স্বাভাবিক রীতিনীতিতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব রীতিনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদেরকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে এবং আন্ত-সম্পর্ক আরও বেশি কার্যকর ভুমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, পাকিস্তানের আফ্রিদি জনগোষ্ঠী, অষ্ট্রেলিয়ার

আদিবাসীদের মধ্যে সংহতি প্রবল। বসবাসের ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান বেছে নিয়েছে (করিম, ২০০৯)।

সমাজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর চেতনা ও ঐক্যের বন্ধন। বেঁচে থাকার জন্য একে অপরকে যেমন সহযোগিতা করছে তেমনি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই নির্ভরশীলতা একে অপরকে আরও বেশি কাছে টেনেছে; একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে সংহতি দৃঢ়তর হয়েছে। আসাবিয়া মতবাদটি মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এর গুরুত্ব ও পরিধি বেড়েছে। আধুনিক সমাজ আরও বেশি একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রতিটি একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। বিশ্বায়নের যুগে গতিশীলতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতাই সমাজে সংহতিকে আরও দৃঢ় করেছে (সেন, ২০০৫)। সমাজের গন্ডি পেরিয়ে এ সংহতি আরও ব্যাপক রূপ নিয়েছে ।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য সমাজে বসবাস করছে এবং প্রয়োজনগুলো সবাই মিলে মেটানোর চেষ্টা করছে। মাজলোর চাহিদা তত্ত্ব অনুসারে প্রাথমিকভাবে মানুষ তাদের প্রথম স্তরের চাহিদাগুলোর পর অন্য চাহিদাগুলো পুরণের জন্য একে অপরের প্রতি মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন মানুষকে আরো বেশি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। চতুর্থ স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে সংহতি মতবাদ অনেক বেশি কার্যকর। এ সংহতির কারণে একত্রে শান্তিপুর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। মানুষের মাঝের সুকুমার বৃত্তির চর্চা বেড়েছে; বেড়েছে মনুষ্যত্ববোধ। এ সংহতির কারণে সমাজে মানুষ তাদের প্রযোজনে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনকি সংহতির প্রভাব আধুনিক রাষ্ট্রের শহুরে সমাজ ব্যবস্থায়ও পড়েছে। আসাবিয়ার মূল-চালিকা শক্তি তথা আত্মীয়তা, ধর্ম পরিচয় সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভূমিকা রাখছে যার প্রতিফলন দেখতে শহুরে সমাজে বসবাসের নিমিত্ত আবাসিক বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে। ধমীয় মিল, চাকরিসূত্রে এক প্রকার আত্মীয়তা ভিন্ন ভিন্ন জেলার মানুষ হওয়া সত্বেও অনেকে মিলে একত্রে বসবাস করার লক্ষ্যে আবাসিক প্লট বা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করছে। এ যেন এক নতুন বর্ধিত আত্মীয়তার বন্ধন যার মূলে রয়েছে সংহতি (করিম, ২০২০এ, ২০২০বি)।

আধুনিক রাষ্ট্র এবং আসাবিয়া

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র সম্পর্কীয় মতবাদ মধ্যযুগের অনেকাংশে সত্যি যখন ক্ষমতা কেবল একটি শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত ছিল। শাসকের শক্তি প্রদর্শন এবং শক্তির মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার যখন রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়মের অংশ ছিল তখন পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মতবাদটি অনেক বেশি সর্বজনীন

ছিল। তবে সময়ের সাথে ক্ষমতা যখন একটি গোষ্ঠীর বাইরের জনগণের হাতে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন বুদ্ধিভিত্তিক বিষয় এবং জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ধারণা করা হচেছ। ক্ষমতার পরিবর্তনশীল চক্র মধ্যযুগে যেভাবে আবর্তিত হয়েছে তারই মাধ্যমে ক্ষমতার সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রসমন্ধীয় মতবাদটি থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসকগণ শিক্ষাগ্রহণ করেছে (সেন, ২০০৫)। যে সব শাসক এ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের ক্ষেত্রে ধ্বংস অনিবার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার যে দার্শনিক রূপটি মধ্যযুগে ছিল তার বহিঃপ্রকাশ বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও রয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে গণতন্ত্র এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। যেসব দেশে এখন শাসকশ্রেণি তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য নিজেদেরকে অপরিহার্য মনে করে এবং প্রতিপক্ষকে রাষ্ট্রক্ষমতার অযোগ্য মনে করে। এ সুযোগে সামরিক ও বেসামরিক হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়।এসব উন্নয়নশীল দেশে এখনও স্তিতিশীল সরকার গঠন সম্ভব হয়ে উঠেনা। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতার মাঝে যখন কোন সরকার মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করে তখন সাধারণ মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে মেনে নেয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটি একটি সম্বলিত সংহতির বহিঃপ্রকাশ যা আধুনিক রাষ্ট্রকে একদিকে উন্নত জাতিরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে অন্যদিকে রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ইবনে খালদুনের আসাবিয়া মতবাদটির ভিত্তিতেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্তিতিশীলতা এবং সংহতির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রের মূল উপাদান নির্দিষ্ট ভুখন্ড, জনসংখ্যা, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব যার মধ্যে সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। আধুনিক রাষ্ট্র ধারণায় এই সাবভৌমত্বই সামাজিক সংহতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কেননা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল জনগণ রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাকে যখন মেনে নেয় তা সমাজের সংহতির বহিঃপ্রকাশ বলে লক্ষ করা যায়।

যেহেতু সমাজ ছাড়া কোন রাষ্ট্র কল্পনা যায় না, সমাজের সকল অনুষঙ্গ এবং বিষয়াদি রাষ্ট্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে (উদ্দিন, ১৯৮৬; ওয়াদুদ, ১৯৫৫)। যেখানে সামাজিক সংহতি যতবেশি সুদুঢ় সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙখলা, রাষ্ট্রীয় উন্নতি লক্ষণীয়ভাবে স্থিতিশীল। এই স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন, ধর্ম, জাতি বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সমপদের আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর এসব সামাজিক প্রভাবশালী আনুষঙ্গ সামাজিক সংহিতর উপাদান হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

খালদুনের রাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্র যখনই প্রতিষ্ঠিত

হয় তখনই একজন শাসকের প্রয়োজন হয় এবং এই শাসকের নিকট সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের প্রতি সবাই মৌন সম্মতি ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয় অপরদিকে সংহতির অগ্রগতিও লক্ষ করে।

উপসংহার

সামাজিক সংহতি হচ্ছে মানুষের শান্তিপুর্ণভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো, সহমর্মিতা দেখানো, প্রয়োজনীয় সম্পদের আদান-প্রদান সর্বোপরি সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের মাধ্যমে সমস্যাবলীকে একত্রে মোকাবিলা করে সমাজে শান্তি শৃঙখলা বজায় রাখা। সামাজিক সংহতি মতবাদটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক গুরুত্বপুর্ণ এবং অপরিহার্য অনুষঙ্গ । এ মতবাদের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং পরবর্তীতে পূর্ণতা লাভ করে।

তথ্য নির্দেশিকা

1. ইসলাম, ড. আমিনুল (১৯৯১), মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা বাজার, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

2. খালদুন, ইবনে (১৯৭২), আল-মুকাদ্দিমা (অনূদিত- নুর মোহাম্মদ মিয়া), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

3. Bukhari ,S.M.M. H. (2010) The Incoherence of Islamic Social Sciences: Some Lessons from Imam Ibn-i-Khaldoon, Pakistan Business Review July 2010

4. Gierer, A. (2001) Ibn Khaldun on Solidarity ("Asabiyah") - Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison, Electronic version of the article in: Philosophia Naturalis 38, pp. 91-104 (2001).

5. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০০৯), 'Ethnic and Racial Inequality in Employment in United Kingdom: Reality and Reasons' Bangladesh Jounral of Public Administration, Vol-18, No. 2, pp. 43-63.

6. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০২০এ), Unplanned Housing in Bangladesh: The Problem with Housing Societies, https://www.urbanet.info/unplanned-

housing-in-bangladesh

7. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০২০বি), 'Life in the time of coronavirus in Bangladesh and elsewhere', https://southasiamonitor.org/index.php/open-forum/life-time-coronavirus-bangladesh-andelsewhere

8. উদ্দিন, মুহাম্মদ আয়েশ (১৯৮৬), রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, ঢাকা: দি স্ট্রার প্রেস।

9. ওয়াদুদ, আবদুর (১৯৫৫), মুসলিম মনীষা, কলকাতা।

10. সেন, ড. রঙ্গলাল এবং নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৫), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা: নিউ এজ পাবরিকেশন্স।

11. Gaksu, A. (2007) Ideals and Realities: Ibn Khaldun's Justification of Asabiyya and Political Power felsefe dinyasi, 2007/2, sayi 46

12. Haller, A. O. (2009) Empirical Stratification Theory: Ibn Khaldun (1377) to Today, Population Review, Volume 48, Number 2, 2009, p. (Article), Published by Population Review Publications, DOI: 10.1353/prv.0.0019

13. Martin, D. (1970), The Nature and Types of Sociologyal Thought, London: Routhledge and Kegah Paul

14. Mouritz, T., 2010. Comparing the social contracts of Hobbes and Locke. The Western Australian Jurist, 1(1), pp.123-127.

15.Spengler, O., 1991. The decline of the West. Oxford University Press, USA.

16. Spittler, G. (2008) Work and Needs as Basis of Civilization: Ibn Khaldûn's Muqaddima in Comparison(This is an expanded and modified version of a paper I wrote for the conference on "Ibn Khaldûn – Contemporary Readings" plannned by AUB and Orient-Institut to take place in Beirut on 9-10 May 2008, which had to be cancelled due to the political situation) (www.//scholar.google.com)

17. Wajdi dusuki, A (2006) Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn Khaldun's Concept of 'Asabiyah, Paper presented at Monash University 4th International Islamic Banking and Finance Conference. Kuala Lumpur on 13-14 November.

জাপানের নতুন শ্রম অভিবাসন নীতিঃ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

মোঃ সাইফুল্লাহ আকন[১], শিবলী নোমান[২] এবং আফনান নূর ভূঁইয়া[৩]

Abstract

The research paper analyzes Bangladesh's potential new labour market and its challenges in the wake of the new immigration policy promulgated to address population decrease and skilled workforce crisis in Japan. Historically, Japan has been kind of restricted in accepting foreign workers. But in recent times, acute population crisis and the lack of skilled workers in Japanese companies led Japan to abandon its conservative thought and bring about a change in immigration policy. On the other hand, Japan's immigration policy amendment has opened the door to a new labour market in front of Bangladesh. In the post-independent period, the principal destination of the Bangladeshi labour migrants has been the Middle East, Europe, and some countries in Southeast Asia. The newly unveiled labour market (Japan) is considered to be the next destination for Bangladeshi skilled workers. However, the research paper gives a comprehensive idea of Japan's current immigration policy as well as a detailed picture of how potential the market is for Bangladeshi workers and what issues to monitor in this regard.

সূচনা

জাপান, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির দেশ, বিগত কয়েক দশক ধরে মারাত্মক অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সংকটের সম্মুখীন। একদিকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে জন্মহার হ্রাসের ফলে জাপানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সংকুচিত হচ্ছে। জাপানি কোম্পানিগুলোতে এই উদ্ভূত শ্রম ঘাটতি সে দেশের অর্থনীতিতে একটি বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (Green, 2007 & Peng, 2016)। দেশটিতে ক্রমাগত অর্থনৈতিক পিছুটান, স্বাস্থ্য সেবা, নির্মাণ, কৃষি সহ অন্যান্য খাতে কর্মী সংকটের দরুন জাপান সরকার অবশেষে বাধ্য

১ প্রভাষক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: msakon72@gmail.com
২ প্রভাষক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: shiblee99@gmail.com
৩ গবেষক, সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: sarah110.rk@gmail.com

হয়েছে অভিবাসন ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘদিনের রক্ষণশীল নীতি থেকে বের হয়ে আসতে।

জাপানি সমাজ ব্যবস্থায় অভিবাসন প্রথাকে সর্বদাই নেতিবাচক রূপে দেখা হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে অনিচ্ছা পোষণ করেছে, যার প্রধান কারণ তার অনন্য ইতিহাস। জাপানের এই 'হোমোজেনাস সোসাইটি' (Woldhuis, no date) এর পাশাপাশি জাপানে একটি লম্বা সময় ধরে 'জেনোফোবিয়া' বা বিদেশীদের প্রতি আতঙ্কের মনোভাব বিরাজমান ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দী থেকে জাপানে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। অবশেষে দেশটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে এবং শ্রম ঘাটতি মেটাতে জাপান সরকার ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল অ্যান্ড রিফিউজি রিকগনিশন অ্যাক্টটি ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ডায়েটের (জাপানের পার্লামেন্ট) নিম্নকক্ষে সংশোধন করে একটি নতুন আইন পাস করে। সংশোধিত অভিবাসন আইন জাপানে আরো বিদেশি শ্রমিক প্রবেশের অনুমোদন দেয়, যা ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয় (Walia, 2019)।

জাপানের অভিবাসন আইন সংশোধন করার ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যারা মূলত দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সাথে জড়িত, জাপানের নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য স্ব স্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। যদিও এক্ষেত্রে জাপানের প্রথম পছন্দ চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ইত্যাদি। তবে জাপানের এই নতুন শ্রম বাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্যও একটি বড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

বাংলাদেশ একটি শীর্ষস্থানীয় শ্রম সরবরাহকারী দেশ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক গন্তব্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। তবে সাম্প্রতিক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে বাংলাদেশি শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরও পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের গ্রহণ করছে না এবং বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে দিচ্ছে। যা দেশের রেমিটেন্স খাতকে নিঃসন্দেহে একটি বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিদেশে কর্মী পাঠানোর কোন বিকল্প নেই। সমসাময়িক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বজুড়ে নতুন সম্ভাবনা সন্ধানের জন্যও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

অন্যদিকে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা উত্তর সময় থেকে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (Akon, Rahman and Bhuiyan, 2019)। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। ফলে জাপানের নতুন উদ্বোধনী শ্রমবাজারটি বাংলাদেশি দক্ষ শ্রমজীবীদের একটি সম্ভাব্য গন্তব্যে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যাইহোক, এই গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানে প্রবেশের

সম্ভাবনা এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো খুঁজে বের করা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে মূলত গবেষণার গুণগত এবং দ্বৈতীয়িক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে জাপানের নতুন অভিবাসন নীতি, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নতুন অভিবাসন নীতির ফলে জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে গুণগত তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য সংখ্যাগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত কিছু তথ্যও উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে সমসাময়িক জাপানে জনসংখ্যা ও শ্রম ঘাটতির বর্তমান চিত্র, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা প্রাসঙ্গিক দ্বৈতীয়িক সাহিত্যের সাথে তুলনামুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ক) তথ্যের উৎস

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত অভিবাসন সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ডাটাবেস- যেমন Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization (JITCO), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ (আইপিএসএস), বিশ্বব্যাংক, জাপানের 'স্বাস্থ্য, শ্রম এবং কল্যাণ মন্ত্রণালয়', বাংলাদেশের 'জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন এবং পত্রপত্রিকা থেকেও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অভিবাসনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

অভিবাসন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং অভ্যস্ত। বিভিন্ন কারণে মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। খাদ্যাভাব দেখা দিলে আদিকালে অভিবাসিত হতো মানুষ; পরবর্তীতে কাজের সুবিধা, উন্নততর জীবন ব্যবস্থা, অধিক বেতন ইত্যাদি কারণ অভিবাসনে উতসাহিত করে মানুষকে। তবে কখনো গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্র কর্তৃক ভীতি বা চাপ তৈরি, জীবনের ঝুঁকি, বেকারত্ব, নিম্নমানের বেতন কাঠামো ইত্যাদি কারণেও অভিবাসন ঘটে। যেসব দেশে অভিবাসননীতি তুলনামূলক সহজতর সেসব দেশ অধিক

সংখ্যক অভিবাসীদের গন্তব্যে পরিণত হয়। তাত্ত্বিকগণ তিন দিক থেকে অভিবাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমতঃ 'ম্যাক্রো' তত্ত্বসমূহ যা মূলত অভিবাসনের কাঠামোগত ও উদ্দেশ্যমূলক অবস্থার উপর জোর দেয় (Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। এই তাত্ত্বিকগণ প্রধানত অভিবাসনের 'পুশ' (ধাক্কা) এবং 'পুল' (টানা) কারণগুলোর উপর নির্ভর করে অভিবাসনকে ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ভিত্তি। জাপানের জীবনযাত্রার মান, কাজের সুযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা, নিরাপত্তা বাংলাদেশ থেকে উন্নততর হওয়ায় বাংলাদেশি নাগরিকদের অভিবাসনের জন্য পছন্দের তালিকায় জাপান অন্যতম। এছাড়াও, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী বিশেষতঃ প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যারা সম্মানজনক চাকুরী এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট কিন্তু দেশে যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে অভিবাসনে উৎসাহী তাদের প্রথম পছন্দ জাপান। উল্লেখ্য, জাপানের সামাজিক মূলধন যা তৈরি হয় দীর্ঘ সময়ের সামাজিক আচার-ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের সংরক্ষণের কারণে তা 'পুল ফ্যাক্টর' হিসেবে কাজ করে। জাপানের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় আরেকটি বড় প্রণোদনা।

দ্বিতীয়তঃ 'মেসো' তত্ত্বসমূহ যা উপর্যক্ত প্রথমটিকে বাতিল করে অভিবাসনকে একটি জটিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পারিবারিক যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ইত্যাদিকে অভিবাসন প্রক্রিয়ার নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে (Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। এ তত্ত্বের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে অভিবাসন কীভাবে, কখন, কী কারণে ঘটে তা ব্যাখ্যা করা যায়। জাপান-বাংলাদেশ আন্ত-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ঐতিহাসকভাবেই বন্ধুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জাপান বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার চেষ্টা করেনি বা করছে না। জাপানে বাংলাদেশিদের অভিবাসন দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলোর চেয়ে কম হলেও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে। যারা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে জাপানে বসবাসরত আছেন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যাওয়ার ও সেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার চেষ্টাও করেন। এছাড়া বাঙালি ও জাপানিদের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মিল থাকার কারণে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এক চমৎকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এটি অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে। অতএব, মেসো তত্ত্বসমূহও এই প্রবন্ধের প্রধান যুক্তিকে সমর্থন করে।

শেষতঃ 'মাইক্রো' তত্ত্বসমূহ যা মূলত ব্যক্তি পর্যায়ে অভিবাসনের কারণ নির্ধারণী হিসেবে যেসব নিয়ামক কাজ করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করে (Boswell, 2002; Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। জাপানের

জনসংখ্যা ঘাটতির কারণে আবে প্রশাসন যে নতুন অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশি জাপানে অভিবাসনেচ্ছুদের জন্য সুখবর এবং সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাপান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে জাপানে বাংলাদেশিদের অভিবাসন আরও সহজতর হবে তা যেমন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবপর তেমনি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসন বিশ্বায়নের এই যুগে তাই কাঙ্ক্ষিত।

প্রথম দুইটি তত্ত্বের সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসনের সম্ভাবনা এবং প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। অভিবাসন যেহেতু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সেহেতু সুবিধাদির তারতম্য ও পরিবর্তনের চাহিদাই অভিবাসন ঘটাতে পারে। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে জাপানে কাজের সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নত জীবনমান, চিকিৎসার সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা তুলনামূলক শ্রেয় হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে অভিবাসনের ঝোঁক সবসময়ই ছিল। তবে অতি সাম্প্রতিককালে জাপান সরকার নতুন অভিবাসন নীতি গ্রহণ করার ফলে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে উপর্যুক্ত কারণগুলো নতুনভাবে আশার সঞ্চার করে। মূলত এই তত্ত্বের উপরই এর প্রবন্ধের প্রধান যুক্তি নির্ভরশীল।

জাপানে অভিবাসন নীতি ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাপান ঐতিহাসিকভাবেই জাতিগত সমতা এবং তার নিজস্ব সংস্কৃতি কে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে এবং সব সময়ই অভিবাসীদের নিরুৎসাহিত করেছে। অভিবাসীদের প্রতি এই রক্ষণশীল মনোভাব এবং অভিবাসীদের প্রবেশে কড়াকড়ি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাপানে একটি ইউনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার গোড়াপত্তন ঘটেছিল জাপানের তকুগাওয়া যুগে। ১৬০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনরুদ্ধারের (McNabb, 2016) পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর জাপান কার্যত সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, যা জাপানের মানুষদের মধ্যে একধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী (Islander psyche) মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। যদিও এই সময় জাপানের সাথে ডাচ এবং চীনাদের বাণিজ্য ছিল, তবে তা রক্ষণশীল মনোভাব দূরীকরণের খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি।

মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা সময়কালীন জাপানের সাথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং একটি অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিশালী দেশ হিসেবে জাপানের আত্মপ্রকাশ ঘটে (MĚdrzycki, 2017)। এই সময় জাপানের শ্রমশক্তির প্রধান অংশ আসতো মূলত কোরিয়ান এবং চীনা নাগরিকদের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপানের বিভিন্ন শহরে চীনা প্রবাসীরা ছোট ছোট শ্রমজীবী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে থাকে (Kashiwazaki and Akaha, 2006)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে জাপান আবার অন্তরালে চলে যায় এবং

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নিজস্ব মডেল অনুসরণ করে পুনরায় অর্থনৈতিক পরাক্রমশালী দেশে পরিণত হয়। তবে অবাক বিষয় হচ্ছে, স্নায়ু যুদ্ধকালীন এই সময়ে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি কর্মীদের সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কেননা তখন জাপানে কর্মক্ষম তরুণ জনসংখ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে জাপানের কেবিনেট বিদেশী শ্রমিক বিরোধী নীতিমালা গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৮০ দশকে জাপানব্যাপী বিদেশি শ্রমিক নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। কেননা এই সময় জাপানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়,যা 'বাবল ইকোনমি' (অর্থনৈতিক বুদবুদ) হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে জাপানের তৎকালীন 'শ্রম মন্ত্রণালয়' নিয়োগকর্তাদের বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের সুপারিশ করলেও 'বিচার মন্ত্রণালয়' এর বিরোধিতায় তা আর কার্যকর হয়নি (Hamaguchi, 2019)।

তবে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগেনি। দেখা যায় তীব্র শ্রম সংকটের মুখে ১৯৯০ এর দশকে জাপান সরকার তাদের অভিবাসন নীতিতে (ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল এ্যাক্ট বা আইসিএ) সংস্কার এনেছিল ('অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?', ২০১৮) এবং ল্যাটিন আমেরিকায় জাপানি বংশোদ্ভূত বা তাদের উত্তরসূরিদের (যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ল্যাটিন আমেরিকায় চলে গিয়েছিল) জাপানে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং নবায়নযোগ্য ভিসার ব্যবস্থা করেছিল।

পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে 'বিচার মন্ত্রণালয়' এবং 'শ্রম মন্ত্রণালয়' এর মধ্যকার এক সমঝোতার প্রেক্ষিতে জাপানে 'কারিগরি ইন্টার্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম' (Technical Intern Training Program) চালু করা হয়। এই প্রোগ্রাম মূলত ২ বছর মেয়াদী ছিল, যার প্রথম এক তৃতীয়াংশ 'প্রশিক্ষণার্থী' হিসেবে পরিচিত ছিল এবং পরের দুই তৃতীয়াংশ 'টেকনিক্যাল ইন্টার্ন' বা 'কর্মী' হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এই প্রোগ্রাম ৩ বছর মেয়াদী করা হয়, যার প্রথম ১ বছর 'ট্রেইনি' এবং পরের দুই বছর কর্মী হিসেবে বিবেচিত হতো (Hamaguchi, 2019)। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিগুলোতে উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য জাপান ২০১৭ সালে একটি আইন সংস্কার করেন। নতুন এই আইনে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে তাদের বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া হয় (Devnath, 2020)।

তবে সম্প্রতি এই শ্রম সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। জাপানের মন্ত্রীপরিষদ দপ্তরের তথ্য মতে, শ্রম-নিবিড় খাত যেমন নির্মাণ, কৃষি, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট এ প্রায় ১.২ মিলিয়ন শ্রমিকের অভাব বিদ্যমান (Pollmann, 2020)। যে কারণে জাপানের অর্থনীতিতে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাপান সরকার অবশেষে তার অভিবাসন নীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনে এবং তার শ্রমবাজার বহির্বিশ্বের দক্ষ জনশক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দেয়, যা

দেশটির দীর্ঘদিনের শ্রম ঘাটতি মোকাবেলার জন্য একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে কর্মীদের অবশ্যই দক্ষ এবং জাপানি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।

যাই হোক, জাপানের এই নতুন অভিবাসন আইনের লক্ষ্য হচ্ছে যেসব জাপানি শিল্প বা সেবা যেমন কেয়ার গিভার, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ, হস্পিটালিটি, কৃষি – গুরুতর শ্রম ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে তাদের বিদেশি কর্মী সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা (Camas, 2019)। এর মাধ্যমে এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

সমসাময়িক জাপানে জনসংখ্যা ঘাটতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে জাপানে শিশু জন্মহার অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়, কেননা জন্মহার বৃদ্ধির জন্য তৎকালীন জাপানিজ মিলিটারির একধরণের নির্দেশনা ছিল (Harding, 2019)। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্তও শিশু জন্মহারের এই ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত ছিল, যা তৎকালীন জাপানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটায় (Johnston, 2015)। কিন্তু ৯০'র দশক থেকে জাপানে আকস্মিকভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে জাপানে ডেমোগ্রাফিক ক্রাইসিস বা জনবল ঘাটতি প্রবল আকার ধারণ করা শুরু করে, যা বর্তমানে আরো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি, জাপানের মোট জনসংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ (আইপিএসএস) এর তথ্যানুসারে জাপানের জনসংখ্যা প্রায় ১২৮ মিলিয়ন। ধারণা করা হচ্ছে ২০২৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১০০ মিলিয়নের নিচে এবং ২০৬০ সালের মধ্যে ৯০ মিলিয়নের নিচে নেমে আসবে (Akashi, 2014)।

যদিও বিশ্বব্যাংক এর জনসংখ্যা প্রক্ষেপন অনুযায়ী ২০৫০ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ আকার ধারণ করবে (MĔdrzycki, 2017), কিন্তু একই সময় জাপানে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। জাপানে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০১০ সালে যখন এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২৮,০৫৭,০০০ জন (MĔdrzycki, 2017)। এর পর থেকেই মূলত জাপানের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। জনসংখ্যা হ্রাসের এই গতি অব্যাহত থাকলে এশিয়া অঞ্চলে জাপানের নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হয়ে উঠবে।

এখানে দুটি বিষয় জাপানের জন্য খুবই উদ্বেগজনক– ১) বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ২) জন্মহার হ্রাস।

ক) বয়স্ক মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

বিগত কয়েক দশক ধরে জাপানে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে জাপান একটি 'সুপার-এইজড' (Airth, 2020) বা অধিক বয়স্ক জনসমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে চলেছে। জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশের বেশি ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ (Pollmann and Yashiro, 2020), যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। বিগত ৫০ বছরে জাপানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭% ছিল ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা (Akashi, 2014)। তবে জাপানি জনসংখ্যায় বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে, আইপিএসএস এর তথ্যানুসারে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে জাপানের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ এবং ২০৪০ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫.৩ শতাংশ হবে বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা (Japan's Elderly Population Totals Record 35.88 M., 2019)।

খ) জন্মহার হ্রাস

জাপানে ৮০'র দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একদিকে যেমন জাপানিদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, একই সাথে কর্মময় ব্যস্ত জীবনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের জনসংখ্যার উপর। ৯০'র দশক পরবর্তী সময় থেকে জাপানে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে রেকর্ড কম জন্মহার পরিলক্ষিত হয় জাপানে। জাপানের 'স্বাস্থ্য, শ্রম এবং কল্যাণ মন্ত্রণালয়' এর তথ্যানুসারে ২০১৯ সালে জন্ম নেয়া শিশুর সংখ্যা ৮৬৪,০০০, যা ১৮৯৯ এর পরে সর্বনিম্ন (Jozuka, Yeung and Kwon, 2019)।

জনসংখ্যার এই ক্রমহ্রাসমান ধারা জাপানের জনশক্তিকে সংকুচিত করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য সরকারকে পেনশনের বাড়তি অর্থের যোগান দিতে হচ্ছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার এই তীব্র সংকট জাপান সরকারের রক্ষণশীল মতধারা এবং শ্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে একধরণের ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি জাপানের জনগণও বিদেশিদের নিয়ে তাদের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে একটি নতুন মনোভাব পোষণ শুরু করেছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় পিউ রিসার্চের এক গবেষণায়। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০১৮ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে প্রায় ৫৯ শতাংশ জাপানিদের মতে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ জাপানের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে ('অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?', ২০১৮)।

জাপানের নতুন অভিবাসন নীতির বিশ্লেষণ

জাপানের সাম্প্রতিক জনমিতিক পরিস্থিতির দরুণ জাপান তার পূর্বের প্রচলিত আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে। জাপানের শিল্প কারখানা বেগবান রাখা এবং দেশের শ্রম ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে নতুন অভিবাসন নীতির প্রস্তাব করেন। সংশোধিত অভিবাসন নীতির আওতায় জাপান বহির্বিশ্ব থেকে 'ব্লু-কলার' সেক্টরে কর্মী গ্রহণ করবে। সংশোধিত আইনটি অভিবাসনের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মতধারার জাপানে একটি কঠোর নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ২০১৯ সালে কার্যকর হবার পর থেকে পরবর্তী ৫ বছরে আনুমানিক ৩৪০,০০০ বিদেশী শ্রমিকের জাপান আগমনের পথ প্রশস্ত করেছে (Osaki, 2018)। শ্রমিকরা উচ্চ-দক্ষতা এবং কম দক্ষতা সম্পন্ন উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োগের সুযোগ পাবে, যদিও উভয়ের ক্ষেত্রেই জাপানি ভাষায় দক্ষতা বাধ্যতামূলক।

নতুন অভিবাসন আইনটি ডিজাইন করা হয়েছে মূলত জাপানের বিদ্যমান 'টেকনিক্যাল ট্রেইনি প্রোগ্রাম' এর সমস্যা সমাধানকল্পে। পূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে কম খরচে এবং কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ দেয়া হতো এবং ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৮০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী গ্রহণ করা হয়েছে (Obe, 2019)। সংশোধিত অভিবাসন আইন অনুযায়ী মূলত দুই ধরণের ভিসার ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ ভিসা টাইপ ১ এবং ভিসা টাইপ ২।

ক) ভিসা টাইপ ১

টাইপ ১ – ভিসায় আবেদনকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত এবং জাপানি ভাষায় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু এর পূর্বে অর্থাৎ টেকনিক্যাল ট্রেইনি প্রোগ্রামে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ আবেদন করতে পারতো অথবা নিয়োগ পেতে পারতো। অন্যদিকে, এই ভিসায় আবেদনকারী কর্মীরা নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে পারবে (যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না) এবং বার্ষিক চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে পাঁচ বছর পর্যন্ত জাপানে অবস্থান করতে পারবে। টাইপ ১ শ্রেণির ক্ষেত্রে ভিসা শুধুমাত্র কর্মীদের প্রদান করা হবে এবং এক্ষেত্রে তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানরা এই ভিসার আওতাধীন থাকবে না। এই শ্রেণির কর্মীদের মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) প্রতিষ্ঠানের শ্রম ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়োগ দেয়া হবে এবং এই টাইপের ভিসার কর্মীদের জন্য ১৪ টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেবিল ১ঃ ভিসা টাইপ ১ এর অনুমোদিত পেশাগত খাত

সেক্টর	সেক্টর
নার্সিং কেয়ার	কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং ক্লিনিং ম্যানেজমেন্ট	ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি
মেশিন পার্টস ইন্ডাস্ট্রিজ	অটোমোবাইল
জাহাজ শিল্প	কৃষি
ম্যাটেরিয়াল প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রি	বাসস্থান
এভিয়েশন	মৎস্য
খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন শিল্প	খাদ্য সেবা শিল্প

উৎসঃ https://www.jitco.or.jp/en/skill/index.html

খ) ভিসা টাইপ ২

উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জন্য টাইপ ২ ভিসা কার্যকর করা হয়েছে। এই ভিসা অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা যাবে এবং কর্মীরা তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের জাপানে নিয়ে আসতে পারবেন। পরবর্তীতে এই ভিসার আওতাধীন কর্মীরা জাপানে স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করে পারবেন। বর্তমানে টাইপ ২ ভিসার অধীনে শুধুমাত্র কন্সট্রাকশন এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে (Obe, 2019)। এই ভিসার অধীনে কর্মীদের জাপানি ভাষা দক্ষতার উপর পরীক্ষা দিতে হবে না, তবে তার স্ব স্ব কাজের দক্ষতার উপর একটি পরীক্ষা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আধুনিক করতে জাপান সরকার একটি নতুন অনলাইন অভিবাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। এই নতুন ভিসা এবং অনলাইন ব্যবস্থা ২০২০ সালে বাস্তবায়ন হবার কথা এবং এই ভিসায় চীনা কর্মীরা প্রথম অগ্রাধিকার পাবে (Camas, 2019)। পাশাপাশি ভিসা টাইপ ১ এর কর্মীরা তার স্ব স্ব ফিল্ডে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হলে ২০২১ সাল থেকে ভিসা টাইপ ২ এ আবেদন করতে পারবেন।

নিয়োগকর্তাদের ভূমিকা

সংশোধিত আইন অনুযায়ী বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। বিদেশি কর্মীদের জাপানে প্রবেশের পর তাদের ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেয়া, তাদের বসবাসের মত উপযুক্ত নিবাস খুঁজে দেয়ার কাজ নিয়োগকর্তাদের করতে

হবে। সংশোধিত এই নতুন অভিবাসন আইন এবং 'বিচার মন্ত্রণালয়ের' এক অধ্যাদেশ অনুসারে নিয়োগকর্তারা বিদেশি শ্রমিকদের জাপানি নাগরিকের সমতুল্য বা বেশি বেতন দিবেন এবং শ্রমিকদের বেতন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দিবেন (JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 , 2019)। যেহেতু বিদেশি কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আসবে যাদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন, তাই এই কর্মীদের জাপানের সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে বিদেশি কর্মীদের জন্য ভাষা শিক্ষা, নিয়ম কানুন এবং রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি, এই কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে জাপান সরকার বিদেশি ভাষায় কর্মীদের কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সেবা এবং শিশু লালন-পালনের উদ্দেশ্যে সারা দেশে ১০০ টি পরামর্শ কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 , 2019)। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা কর্মীদের চিকিৎসা সেবা ও বাসস্থান নিশ্চিত করবে।

জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যকে বিবেচনা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশগুলো যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইনে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি কর্মীরা অবস্থান করছে। মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরে ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার তৈরি হয়েছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর তথ্যানুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৮,১৩,৪৯৯ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে গমন করেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০১৮ সালেই গিয়েছে ৬,১৪,৫৮৫ জন কর্মী, যদিও ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০,০৮,৫২৫ জন (এর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন হিসেবে গিয়েছেন ৬৯০,০৪৬ জন) (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ২০১৯)। টেবিল ২ এ ২০১৭ সালে বাংলাদেশি 'নতুন' কর্মীদের শীর্ষ দশটি দেশে গমণের সংখ্যা তুলে ধরা হলো।

দেশ	কর্মী সংখ্যা
সৌদি আরব	৩৯২,৬০২
ওমান	৬৪,১৪৮
কাতার	৬৩,০৪৮

মালায়েশিয়া	৩৬,৯১৫
কুয়েত	৩৫,৪৫২
সিঙ্গাপুর	২৭,৮১৭
বাহরাইন	১৭, ৪৬৩
জর্ডান	১৪, ২১১
অন্যান্য দেশ	৩৮,৩৫২
মোট	৬৯০,০৪৬

উৎসঃ (Qayum, 2017)

কিন্তু সম্প্রতি এর উল্টো চিত্রই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, দেশে দক্ষ কর্মীর চেয়ে অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর চিত্রটা নিম্নমুখী। ২০১৮ সালে যেখানে প্রায় ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি জমালেও ২০১৯ সালে এই সংখ্যা কমে মাত্র ৭ লাখ ১৫৯ কর্মী বিদেশে যেতে পেরেছে। অর্থাৎ মাত্র ১ বছরে প্রায় ৩৪ হাজার কর্মী কমে গিয়েছে (হুদা, ২০২০)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির বড় তিনটি বাজারের দুইটি দীর্ঘদিন ধরেই নানা জটিলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশাল শ্রমবাজার, যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশি কর্মী নিতে গড়িমসি করছে এবং নানা রকম শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। প্রায়শ বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক দেশে ফেরত আসতে হচ্ছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, সৌদি আরব সহ বেশ কিছু দেশের অবস্থাও প্রায় একই রকম। সেখানে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশি কর্মীরা যেতে পারছে না। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যা কিনা বাংলাদেশের কর্মীদের প্রধান গন্তব্য ছিল, তা আজ প্রায় নয় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে (হুদা, ২০২০)।

পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর ধরে শোষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নারী গৃহকর্মীদের প্রতি শারীরিক অত্যাচার, হয়রানি এবং সর্বোপরি নিয়োগ সংস্থাগুলোর প্রতারণার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার অনেকটাই আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। অদক্ষতা, নির্যাতন, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, পলায়ন এবং অন্যান্য কারণে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে কর্মীরা দেশে ফেরত আসছে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারী সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধের দিকে। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য জনপ্রিয় এই শ্রম বাজার অনেকটাই ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশি কর্মীরা বা বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রম বাজার নানা ঝুঁকির

মধ্যে পতিত হচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ অন্যান্য শ্রমবাজার খুঁজতেও অনেকটা ব্যর্থ বা বাংলাদেশ এই তিনটি বড় শ্রমবাজারের বাহিরে নতুন কোন বাজারে প্রবেশ করতে পারেনি, যা দেশের বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অশনিসংকেত।

জাপান সরকার ২০১৮ সালে তার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার ফলে বাংলাদেশি কর্মীরা কিছুটা আশার আলো দেখছে, যদিও তা এখনো বাংলাদেশের অনুকূলে নয়। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২০ সাল নাগাদ মোট ১ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক দেশের বহিরে যায়, যার মধ্যে মাত্র ০.০২ শতাংশের গন্তব্য হয় জাপান (Devnath, 2020)। তবে রেমিন্টেন্স পাঠানোর দিক থেকে জাপানের প্রবাসীরা ভালো অবস্থানেই রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানপ্রবাসীদের কাছ থেকে প্রায় ৪৪.৪৪ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছে।

জাপানে বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসনের সম্ভাবনা

জাপান সরকার তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীল রাখা এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ঘাটতি দূরীকরণে যে নতুন অভিবাসন আইন পাশ করেছে তা বাংলাদেশের মত জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশের জন্য নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। জাপান অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ থেকেও দক্ষ কর্মী নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্যে গত ২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট জাপানের রাজধানী টোকিওতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয় (The Daily Star, 2019)।

ইতোমধ্যে বিএমইটি জাপানের কর্মী নিয়োগদাতা সংস্থা – ইন্টারন্যাশনাল ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আইএম) এর সাথে ২০১৭ সালের ১২ মার্চ (ইয়াসমিন, ২০১৯) একটি চুক্তি করে, যার আলোকে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ৫৫০ জন তরুণ উচ্চ মাধ্যমিক পাস নারী-পুরুষের কারিগরি ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয় (Devnath, 2020)। পাশাপাশি বিএমআইটি এর উদ্যোগে চার মাস মেয়াদে দেশের বিভিন্ন জেলার ২৭টি কেন্দ্রে ৪০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে (Ovee, 2019)। ভাষাগত জ্ঞান লাভের পর তারা ভাষার দক্ষতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে উত্তীর্ণ কর্মীদের 'আইএম' এর ব্যবস্থাপনায় আরো চার মাস প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শেষে এই কর্মীদের আইএম এর মাধ্যমে জাপানে শিক্ষানবিশ হিসেবে পাঠানো হবে (Ovee, 2019)।

পাশাপাশি এই চুক্তির আওতায় জাপান ৩ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১ হাজার টেকনিক্যাল

ইন্টার্ন নেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, এই ব্যুরোর প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় ২০০০ জন কর্মী জাপানে গিয়েছেন (Devnath, 2020)। এছাড়া ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৬৩ জন কর্মী জাপানে গমন করেছেন (আবদুল্লাহ, ২০১৯)।

জাপানে বর্তমানে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা তুলনামুলক কম হলেও প্রবাসী আয়ের দিক থেকে একদম পিছিয়ে নেই। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রবাসী আয়ের শীর্ষ দেশ গুলোর মধ্যে জাপানের অবস্থান ২০তম। জাপান সরকারের বর্তমান নতুন অভিবাসন নীতি অনুযায়ী আমরা দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারলে জাপান হবে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনাময় শ্রম বাজার, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, জাপানের এই বিশাল শ্রম বাজার ধরতে বাংলাদেশকে অবশ্যই দ্রুততার সাথে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে দীর্ঘমেয়াদী সময় নিলে বা কালক্ষেপণ করলে অন্যদেশ এই সুযোগটা কেড়ে নিবে। কেননা, একে তো তাদের দক্ষ কর্মশক্তি বেশি, অন্যদিকে জনশক্তি রপ্তানিতে তারা দীর্ঘ সূত্রিতা এড়িয়ে চলে। ফলে, বাংলাদেশ তার কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরিতে সময় অপচয় করলে বাংলাদেশ এই নতুন শ্রমবাজারটিকেও হারিয়ে ফেলবে।

জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিক অভিবাসীদের চ্যালেঞ্জ

জাপান সরকারের গৃহীত নতুন অভিবাসন আইনের ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য একটি বড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হলেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাও সহজেই অনুমেয়। জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) ভাষাগত সমস্যা

জাপানে প্রবেশের পরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সবচেয়ে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় তা হল জাপানি ভাষা রপ্ত করা। জাপানে কাজ করতে হলে একজন বিদেশি শ্রমিকের জন্য জাপানি ভাষায় দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। বাংলাদেশি কর্মীরা সাধারণত স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় অন্য ভাষা রপ্ত করা অনেকটাই কঠিন। জাপানে মূলত জাপানি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার প্রচলন খুবই সীমিত। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানি ভাষাতেই যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, যা আপাত দৃষ্টিতে কষ্টসাধ্য। তবে জাপানে যাওয়ার পূর্বে দেশ থেকে জাপানি ভাষায় ভালোভাবে চর্চা করে গেলে খুব একটা বিপদে পড়তে হবে না।

খ) ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশ এবং জাপান এশিয়ার দুইটি বন্ধু রাষ্ট্র হলেও ভৌগোলিক দূরত্ব এবং স্বল্প যোগাযোগের হেতু দুই দেশের মধ্যকার ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ভিন্নতা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশি কর্মীরা জাপানে গিয়ে প্রথম দিকে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাপানীরা ঐতিহাসিকভাবেই কর্মঠ জাতি। তাদের সময়জ্ঞান এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেকারণে সঠিক সময়ে কাজে যাওয়া, জাপানি আচার-ব্যবহার যথাযথ ভাবে পালন করা, এবং সর্বোপরি তাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত না হতে পারলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য জাপানে টিকে থাকা অনেকটাই দুরূহ হয়ে উঠবে।

গ) শোষণের শিকার

প্রথমত, জাপান বিদেশি শ্রমিকদের জন্য একটি উন্নত পরিবেশের সুযোগ দিলেও তাদের যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৯৯০ এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে শ্রমিক গ্রহণ করলেও ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তাদের স্ব স্ব দেশে ফেরত যেতে বাধ্য করা হয়। জাপানে অভিবাসন সংক্রান্ত সংশোধিত আইনটি পাশ হবার পর থেকেই বিরোধীদল যুক্তি দেখিয়েছে যে যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে বিদেশি শ্রমিকরা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণের শিকার হতে পারে। এছাড়া এই কর্মীরা তাদের কাজের তুলনায় কম মজুরী পাওয়ার সম্ভাবনাকেও সামনে নিয়ে আশা হয়েছে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, জাপান সরকার ১৯৯৩ সালে বিদেশি নাগরিকদের জন্য (মূলত চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কর্মীদের) 'টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেইনি প্রোগ্রাম (টিএটিপি)' ব্যবস্থা চালু করে, কিন্তু এই ইন্টার্নদের অনেক ক্ষেত্রেই সস্তা শ্রম প্রদানের জন্য বাধ্য করা হতো (Walia, 2019)। এমনকি ২০১৯ সালে 'বিচার মন্ত্রণালয়' কর্তৃক তদন্তে দেখা যায় যে এই প্রশিক্ষণার্থীদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী মৃত্যুবরণ করে (Pollmann and Yashiro, 2020)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানি নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণের শিকার হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই।

সুপারিশ

জাপানের বিশাল শ্রম বাজার ধরতে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্যঃ

১. পেশাগত দক্ষতাঃ বিশ্ব শ্রম বাজারে এখন দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। জাপানে প্রবেশের ক্ষেত্রেও পেশাগত দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে জাপান কর্মী নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হবে। তাই স্ব স্ব পেশায় দক্ষ না হলে জাপানে প্রবেশ এবং টিকে থাকা বেশ দূরুহ হবে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা লাভের জন্য বিভিন্ন ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট বা কারিগরি প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিশেষ ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করা জরুরী।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য সহ অন্যান্য দেশে কর্মী পাঠালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদক্ষ শ্রমিক পাঠিয়েছে। যেহেতু ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশ সরকারি ভাবে দক্ষ শ্রমিক পাঠাচ্ছে, সেহেতু দক্ষ জনশক্তির অভাবে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার দিনদিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তাই জাপানে কর্মী পাঠানোর পূর্বে তাদের দক্ষতার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় জাপানের মত বন্ধু রাষ্ট্রও শ্রমিক নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

২. ভাষাগত দক্ষতাঃ জাপানে প্রবেশের শর্ত হিসেবে পেশাগত দক্ষতার পরেই জাপানি ভাষা রপ্ত করা অপরিহার্য। জাপানি ভাষা জানা ব্যতীত জাপানে কর্মী হিসেবে প্রবেশ অনেকটাই অসম্ভব। উচ্চ আয়ের চাকুরী পেতে চাইলে কর্মীদের অবশ্যই জাপানি ভাষার এন ফোর লেভেল (জাপানি ভাষায় লিখতে, বলতে ও পড়তে পারা) পাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জাপানি ভাষা শিক্ষায় সহযোগিতা করতে হবে। বর্তমানে জাপানি ভাষা শেখার জন্য বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৭ টির মত ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। দেশব্যাপী নতুন কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি এই কেন্দ্র গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩. জাপানি সমাজ, রীতিনীতি, ও আইনকানুনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানঃ যেহেতু বাংলাদেশি কর্মীরা জাপানে প্রবেশের পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিলিত হবে, সেক্ষেত্রে তাদের জাপানি সমাজ ও রীতিনীতি বিষয়ে আলাদাভাবে কিছু প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। জাপানি ভাষার পাশাপাশি এমন একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক যেখানে জাপানগামীদের জাপানি ভাষা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি শেখানো হবে।

জাপানে কোনটি করা যাবে, বা কোনটি করা যাবে না তার উপর কর্মীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি তাদের জাপানি আইন কানুন সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে বাংলাদেশি কর্মীরা আর কোন অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়বে না। কেননা, বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হলে তা জাপানে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণে বাধার সৃষ্টি করবে।

৪. কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের তদারকিঃ জাপানে বাংলাদেশি কর্মীদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে জাপানস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা পূর্বে বিদেশি শ্রমিকেদের প্রতি জাপানি নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন– কম মজুরী প্রদান, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি এবং প্রস্তাবিত সময়ের চেয়ে দীর্ঘ কাজের সময় ইত্যাদি (Walia, 2019)। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় এবং তারা যেন নির্ভয়ে জাপানে কাজ করতে পারে তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ তদারকি দরকার।

উপসংহার

ঐতিহাসিকভাবে জাপান অভিবাসন বান্ধব রাষ্ট্র ছিল না। অভিবাসন এবং বৈদেশিক শ্রমশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেগবানের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও জাপান সরকার অভিবাসন জোরদার করার জন্য যথেষ্ট কাজ করেনি। অবশেষে ক্রমবর্ধমান কর্মী সংকটের দরুন জাপান সরকার তার রক্ষণশীল নীতি থেকে বের হয়ে ২০১৮ সালে বহু প্রতিক্ষিত অভিবাসন আইন পাশ করে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া এই প্রবিধান একদিকে যেমন শ্রম সংকটে ভোগা জাপানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাবে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, যা ঐ সকল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখবে। লক্ষণীয়, জাপান তার বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের প্রতি এ ব্যাপারে তার অর্থনৈতিক কূটনীতির ব্যাবহার করে কিনা।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দুটি বড় চালিকাশক্তি হচ্ছে রপ্তানি খাত এবং প্রবাসীদের আয় বা রেমিট্যান্স। বিগত কয়েক বছর ধরে রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও মধ্যপ্রাচ্য সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই বিশাল শ্রম বাজার বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে মন্দার প্রভাব পড়েছে তার ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশের এই বৈদেশিক শ্রম বাজারেও। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি কোন কোন দেশে শ্রমবাজারের দরজা বন্ধ হবার উপক্রম । মহামারীর প্রভাবে চলমান অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশকে নতুন নতুন শ্রম বাজার খুঁজতে হবে, এক্ষেত্রে জাপান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বিকল্পগুলোর একটি। ক্রমবর্ধমান কর্মী সংকটের প্রেক্ষাপটে জাপান সরকার কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত অভিবাসন সংশোধন নীতি বাংলাদেশের সামনে একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সচল রাখার ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতির বড় কোন বিপর্যয় প্রতিরোধে বাংলাদেশের নতুন শ্রমবাজার খোঁজার বিকল্প নেই।

যেহেতু জাপান তার বহুল প্রত্যাশিত শ্রমবাজারের দ্বার উন্মোচন করেছে, সেহেতু বাংলাদেশকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ, বিশেষ করে যারা এখন জাপানে কর্মরত আছেন তাঁদের সহায়তা, প্রেরণা এবং দিকনির্দেশনা জাপানের শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের ব্যাপক হারে প্রবেশ এবং সেখানে টিকে থাকায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসতে পারে। জাপানের শ্রমবাজার যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা সহজে পূরণ করে জাপানের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমুন্নত রেখে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাপানের পথ সহজতর করতে পারে অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের এই শ্রমশক্তি।

তথ্য নির্দেশিকা

Akashi, J. (2014) 'Contemporary Japan New aspects of Japan's immigration policies: is population decline opening the doors?', Contemporary Japan, 26(2). doi: 10.1515/cj-2014-0009.

Akon, M.S., Rahman, M. and Bhuiyan, A.N. (2019) 'Japan's Economic Cooperation with Bangladesh: An Appraisal', Social Sciecne Review, 36(2).

Airth, J. (2020) 'What the Japanese can teach us about super-ageing gracefully', BBC, 30 March. Available at: https://www.bbc.com/future/article/20200327-what-the-japanese-can-teach-about-super-ageing-gracefully (Accessed: 30 September 2020).

Boswell, C. (2002) 'NEW ISSUES IN REFUGEE RESEARCH Addressing the causes of migratory and refugee movements: the role of the European Union Evaluation and Policy Analysis Unit Evaluation and Policy Analysis Unit United Nations High Commissioner for Refugees'. Available at: www.unhcr.org (Accessed: 30 September 2020).

Camas, A. (2019) How Japan's New Immigration Laws Are Impacting Mobility, Worldwide erc. Available at: https://www.worldwideerc.org/news/how-japan-s-new-immigration-laws-are-impacting-mobility (Accessed: 30 September

2020).

Devnath, B. (2020) 'Japan opens doors to migrant workers. Can Bangladeshis seize the opportunity? ', The Business Standard , 8 August. Available at: https://tbsnews.net/bangladesh/migration/japan-opens-doors-migrant-workers-can-bangladeshis-seize-opportunity-116692?fbclid=IwAR2CEpBgDEa7fNAzXPXsaiQ9cZjHJTXs10AmbKR-0VQxi8q1NMn9jJC-4ag (Accessed: 30 September 2020).

Green, D., 2017. Immigrant Perception in Japan: A Multilevel Analysis of Public Opinion, Asian Survey, Vol. 57, No. 2, 368-394

Hamaguchi, K. (2019) How Have Japanese Policies Changed in Accepting Foreign Workers?, Japan Labor Issues. Available at: https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2019/014-01.pdf (Accessed: 30 September 2020).

Harding, R. (2019) 'Japan's population decline accelerates despite record immigration | Financial Times', Financial Times, 12 April. Available at: https://www.ft.com/content/29d594fa-5cf2-11e9-9dde-7aedca0a081a (Accessed: 30 September 2020).

Japan's Elderly Population Totals Record 35.88 M. (2019) nippon.com. Available at: https://www.nippon.com/en/news/yjj2019091500338/japan's-elderly-population-totals-record-35-88-m.html (Accessed: 30 September 2020).

JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 (2019) Visa Guru. Available at: https://visa-guru.com/japan-new-work-visa-policy-2019/ (Accessed: 30 September 2020).

Johnston, E. (2015) 'Is Japan becoming extinct? ', The Japan Times, 16 May. Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/16/national/social-issues/japan-becoming-extinct/ (Accessed: 30 September 2020).

Jozuka, E., Yeung, J. and Kwon, J. (2019) Japan's birth rate hits another record

low in 2019 , CNN. Available at: https://edition.cnn.com/2019/12/25/asia/japan-birthrate-hnk-intl/index.html (Accessed: 30 September 2020).

Kashiwazaki, C. and Akaha, T. (2006) Japanese Immigration Policy: Responding to Conflicting Pressures, Migration Policy Institute . Available at: https://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-policy-responding-conflicting-pressures (Accessed: 30 September 2020).

McNabb, D. E. and McNabb, D. E. (2016) 'Tokugawa Isolation, Commerce, and Industry, 1603–1868', in A Comparative History of Commerce and Industry, Volume I. Palgrave Macmillan US, pp. 181–197. doi: 10.1057/9781137503268_11.

Mędrzycki, K. (2017) 'Pioneering New Immigration Policy in the Cont0emporary Japan', Journal of Migration Studies, pp. 68–93.

Obe, M. (2019) 'Five things to know about Japan's revised immigration law ', Nikkei Asia, 1 April. Available at: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-revised-immigration-law (Accessed: 30 September 2020).

Osaki, T. (2018) 'Japan passes controversial immigration bill paving way for foreign worker influx', The Japan Times, 7 December. Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/07/national/politics-diplomacy/japan-set-enact-controversial-immigration-bill-paving-way-foreign-worker-influx/ (Accessed: 30 September 2020).

Ovee, S. (2019) 'Japan to issue over 360,000 skilled workers visa in 5 years', Bangla Tribune, 1 September. Available at: https://en.banglatribune.com/others/news/69981/Japan-to-issue-over-360-000-skilled-workers-visa (Accessed: 30 September 2020).

Peng, I., 2016. Testing the Limits of Welfare State Changes: The Slow-moving Immigration Policy Reform in Japan, Social Policy and Administration, Vol. 50, 278-295

Pollmann, M. (2020) 'Is Japan Ready to Welcome Immigrants? ', The Diplomat, 22 January. Available at: https://thediplomat.com/2020/01/is-japan-ready-to-welcome-immigrants/ (Accessed: 30 September 2020).

Pollmann, M. and Yashiro, N. (2020) RESOLVED: Japan Has Not Done Enough to Bolster Immigration , Center for Strategic and International Studies. Available at: https://www.csis.org/analysis/resolved-japan-has-not-done-enough-bolster-immigration (Accessed: 30 September 2020).

Qayum, N. (2017) Chasing the Dubai Dream in Italy: Bangladeshi Migration to Europe, Migration Policy Institute . Available at: https://www.migrationpolicyinstitute-europe.org/article/chasing-dubai-dream-italy-bangladeshi-migration-europe (Accessed: 30 September 2020).

The Daily Star (2019) 'Japan to hire skilled workers from Bangladesh', 27 August. Available at: https://www.thedailystar.net/politics/japan-hire-skilled-workers-from-bangladesh-1791376 (Accessed: 30 September 2020).

Walia, S. (2019) Japan's new immigration law: A significant step by PM Abe , Observer Research Foundation. Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/japan-new-immigration-law-significant-step-pm-abe-47825/ (Accessed: 30 September 2020).

Wickramasinghe, A.A.I.N. and Wimalaratana, W. (2016) 'International Migration and Migration Theories', Social Affiars, Vol.1, No.5, pp.17-18.

Woldhuis, R. S. (no date) Understanding Japan's new '"Immigration Policy"': Conflicting Discourses and The Politics of Economic Migration.

'অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?' (২০১৮). Available at: https://www.channelionline.com/অভিবাসী-চায়-জাপান-কিন্তু/ (Accessed: 30 September 2020).

আবদুল্লাহ শেখ (২০১৯) 'জাপানের শ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা', সমকাল , 23

August. Available at: https://www.samakal.com/bangladesh/article/19081691/শ্রমবাজারে-জনশক্তি-রফতানির-সম্ভাবনা (Accessed: 30 September 2020).

ইয়াসমিন তানজীনা (২০১৯) 'জাপানে কর্মসংস্থান এবং প্রসঙ্গকথা', jagonews24, 19 December. Available at: https://www.jagonews24.com/opinion/article/546948?__cf_chl_jschl_tk__=3243dedcd647261a693397399b10dbd1ea97df97-1600367760-0-AVdvexQ7gPj6gjq-fZzVDSONJCoCCi1e2J3eZ6u2ltc6rdM6WkMzNNrcx2AqHhjwNestcHuOiAUbRES5goHlW8dzX_ayl3kDMYC4u- (Accessed: 30 September 2020).

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (২০১৯). Available at: http://www.bmet.gov.bd/site/page/616e9401-0617-45a6-a7aa-7237820ed9ed/- (Accessed: 30 September 2020).

হুদা ইবনে নূরুল (২০২০) 'হুমকির মুখে বৈদেশিক শ্রমবাজার', timenewsbd.com, 29 July. Available at: http://www.timenewsbd.net/news/detail/162151 (Accessed: 30 September 2020).

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলিটদের অবস্থা

ড. মো: হাবিবুল্লাহ[১]

Abstract

What Aristotle (384BC-322BC) termed as 'Political Animal', Ibn Khaldun (1332AD-1406AD) termed that as 'Social Animal'` People' live in the society with some sort of leadership and control. This leadership was studied from different dimensions in different times in different countries by the researchers. Leading or opportunate people of a society are usually termed as the Elite by the scholars in social sciences. The Elites in rural societies are also studied in times in different countries. The status and position of rural Elites in Bangladesh are studied by a good number of scholars in different times. It is found that by the passage of time the nature, source and criteria of the rural Elites of Bangladesh are evoluting. The present paper would offer a significant picture of that evolution process studying the Elites of two Unions of Bogra District of Bangladesh. The readers of this paper would notice that the basic sources and criteria to be and to remain as an Elite in rural Bangladesh are singnificantly changed while the ownership of land and the family aristocracy are still working as the constituting factors of Elitehood.

ভূমিকা

বাংলাদেশের সমাজ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং গ্রামই হলো এর মৌলিক সংগঠন। কাজেই গ্রামের সামাজিক কাঠামোর যথোপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতীত গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর তথা সমাজ ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি যেহেতু গ্রামীণ এলিট শ্রেণি, সেহেতু তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ ব্যতীত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন এবং প্রভাব বিস্তারের মূল অনুঘটক হিসেবে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর প্রক্রিয়া সাবলীল ও নিরবিচ্ছিন্ন না হলেও ক্ষমতা কাঠামোয় যথারীতি তাঁরাই অধিষ্ঠিত। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজের ওপর অতীতের আধিপত্যমূলক প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে উন্নয়ন ভূমিকায় নিজেদের নেতৃত্বের অনস্বীকার্যতা প্রমাণে গ্রামীণ এলিটেরা সচেতন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিনির্মাণে শিক্ষা অর্জন, শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অভ্যস্ত

১ সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

তারাই গ্রামীণ সমাজের মূল্যবোধের উৎস। আর এ কারণেই গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, একটি বিশেষ এলাকার গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গবেষণা দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বাংলাদেশের দু'টি ইউনিয়নের গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যাবে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিকরণের কৌশল এবং গ্রামীণ এলিটদের বয়সভিত্তিক নেতৃত্বের অবস্থান। নেতৃত্বের সে অবস্থানকে শিক্ষা, বংশ মর্যাদা, বসত বাড়ির মালিকানা এবং পরিবারের ধরন যে নানামাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে তাও বিশ্লেষিত হবে। সেই সাথে জমির মালিকানা, বাৎসরিক আয়, সম্পত্তির মালিকানা এবং পেশা নেতৃত্বের অবস্থানকে যে দৃঢ় করে সেটিও বিশ্লেষণ করা হবে বর্তমান গবেষণায়।

গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও এর তাৎপর্য

গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থার মুখ্য নির্ণায়ক শক্তি এবং প্রভাব বিস্তারের মজবুত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Rumi, 1985:54)। তবে এ ধারণা নতুন নয়। Karl Marx এ ধারণাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। Marx-এর মতানুসারে রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রধান শক্তি অর্থনৈতিক শক্তি (C.W. Mills, 1968:82)। ঠিক তেমনি সামাজিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মূল শক্তি হলো অর্থনৈতিক শক্তি। মূলতঃ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তবে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য অর্থনৈতিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়।

চৌধুরী (২০০৩) তাঁর মেহেরপুর গ্রাম সমীক্ষায় জমিকে (B.K. Jahangir, 1979; Rumi, 1985; Karim, 1990) গ্রামের উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, জমির মালিকানা এবং অমালিকানার ভিত্তিতে বিভক্ত গ্রামের তিন শ্রেণির জনগণকে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন-ক্রমানুসারে সাজালে এ রকম দাঁড়ায়: ভূ-স্বামী (মালিক), বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন কৃষি মজুর (চৌধুরী, ২০০৩:১৮)। জমিই হলো সামাজিক অসমতার অন্যতম মূল ভিত্তি। তাই জমির মালিকানার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের প্রেক্ষিতেই গ্রামীণ শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। গ্রামের সামাজিক স্তর বিন্যাসের অপর ভিত্তি হিসেবে তিনি উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ মর্যাদার প্রেক্ষিতে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত: যেমন খানদান (ফার্সী শব্দ খানদান অর্থ বংশ বা গোষ্ঠী। এখানে পূর্ব থেকে সুনাম ও যশ-খ্যাতিসম্পন্ন কোনো পরিবার বা গোষ্ঠীর সদস্যকে খানদান বলা হচ্ছে), গেরস্থরা (গেরস্থ অর্থ গৃহস্থ। কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি গৃহস্থ হিসেবে পরিচিত) ও কামলা। খানদানরা উচ্চ, গেরস্থরা মধ্য এবং কামলারা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের তৃতীয়

ভিত্তি হিসেবে ক্ষমতাকে উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতার অসম বিন্যাসের প্রেক্ষিতে গ্রামের জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্যদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী নয়। গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে (চৌধুরী, ২০০৩:২৪)। এ বিশ্লেষণ চূড়ান্ত ধরে নিলে উন্নয়ন ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে মর্যাদার জন্য অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা কখনো কখনো এর উল্টোটাই হয়। কেননা উন্নয়ন ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বর্তমান এলিটিয় মর্যাদার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

Mukhurjee (1971) তাঁর নিরীক্ষিত গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক ক্রমবিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। এ বিন্যাসের শীর্ষে অবস্থানকারী প্রথম শ্রেণির মধ্যে রয়েছে চাকুরে, জোতদার এবং ধনী কৃষক শ্রেণি। প্রথম শ্রেণির জনগণের জীবন সহজ ও সমৃদ্ধিময়' (Mukhurjee, 1971:154)। আবার Bertocci এর মতে, কৃষি সমাজে জমির মালিকানা এবং জমির সাথে সম্পর্ক সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির মাঝে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি {বার্টোসি (বাংলায়), ১৯৯২: ৫৬}। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার হাজীপুর ও তিনপাড়া গ্রামের সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ মর্যাদার সাথে ভূমি মালিকানার অনুবন্ধন লক্ষ্য করেন। যদিও শ্রেণি-বৈষম্য মর্যাদা সম্পর্কের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত, তারপরও সব সময় সম্পত্তি দিয়ে মর্যাদার গুণাবলী স্বীকার করা হয় না। হাজীপুর ও তিনপাড়া গ্রাম দু'টোতে শ্রেণি ও মর্যাদা এ উভয়কে চিহ্নিত করতে বার্টোসি জমির মালিকানা ও আয়ের উৎসের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক দলের প্রাথমিক শ্রেণি বিভাগ দেখিয়েছেন এবং মাওবাদের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাস করেছেন। আর তা হলো ধনী, মধ্যবিত্ত এবং গরীব চাষী (বার্টোসি,১৯৯২)। বহু পুরানো এই সমীক্ষাগুলো তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সময়ের বিবর্তন ধারায় বর্তমানে এ শ্রেণি বিন্যাস চূড়ান্ত নয়। ভূমি মালিকানার সাথে সাথে ব্যবসা, চাকুরি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং শহরের সাথে যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Jahangir (1982) *Rural Society, Power Structure and Class practice* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ভূমিতে মালিকানা ও কর্তৃত্ব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার এনে দেয়। অর্থাৎ তিনি ভূমি মালিকানা এবং ক্ষমতার মধ্যে একটি সহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার Karim (1990) ভূমি এবং ক্ষমতার সাথে বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রভাবের মধ্যে ঐক্য সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন (Karim, 1990:7)। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণের এ সকল ধ্রুপদী বিশ্লেষকগণ ভূমি মালিকানা, ক্ষমতা, মর্যাদা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং জীবনমানের ক্রমচ্চোবিন্যাসের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস দেখিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে,

উপরোক্ত সবগুলো ইতিবাচক গুণাবলীর অধিকারীরাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি গ্রাম এবং শহরের ব্যবধানকে হ্রাস করেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের আকাঙ্খা গ্রামীণ ক্ষমতাবানদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। তাছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা একসময় তাদের জীবিকা এবং পেশার প্রয়োজনে বর্গা চাষের ওপর নির্ভর করতো। তৃণমূলে এনজিওসমূহ বিনা জামানতে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাবলম্বীতা অর্জনের আশার সঞ্চার হয়েছে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের ওপর ক্ষমতাবানদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য চ্যালেঞ্জে পড়েছে। এতে ক্ষমতাবানদের প্রতি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শর্তহীন আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতাবানরাও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব প্রতিষ্ঠার বিকল্প পন্থা 'উন্নয়ন ভূমিকা' গ্রহণে মনোযোগী হয়েছেন। ক্ষমতাবান এবং উন্নয়ন ভূমিকা পালনে আগ্রহী এই সীমিত ব্যক্তিবর্গই গ্রামীণ এলিট। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এ শীর্ষ স্থান অধিকারীরাই বর্তমান গবেষণায় এলিট শ্রেণি বলে গণ্য হবেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ সকল গবেষক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণি বিন্যাস করেছেন মূলতঃ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো অথবা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য। সুতরাং তারা ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে তৎপর ছিলেন না। কিন্তু গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ জরুরী। তাছাড়া উপরোক্ত গবেষকগণ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিশ্লেষণে ভূমি, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করলেও 'ভূমিকা' বিষয়টির সাথে ঐসব বিষয়ের অনুবন্ধন নির্ণয়ে প্রয়াসী ছিলেন না। গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই জরুরী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'ভূমিকার' ভিত্তিতে এলিট মর্যাদা লাভ একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা। এ কারণেই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে গ্রামীণ প্রভাবশালীদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিকভাবে নিজেদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে এবং সর্বোপরি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করতেও তারা তৎপর। তাদের এ তৎপরতাই তাদেরকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ ভূমিকা পালনকে অনুষঙ্গ করেই তাদের মধ্য থেকেই আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব যেমন গড়ে উঠে, তেমনি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উদীয়মান নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটে। যদিও এসব গ্রামীণ এলিটেরা বয়সে তরুণ, তারপরও তারা খানদান পরিবারেরই সদস্য (Karim, 1990)। স্থানীয় এলাকায় নিজেদের মর্যাদা এবং প্রভাবকে সমুন্নত রাখতে তারা নেতৃত্বের ঐতিহ্যিক আরোপিত ধারার পরিবর্তে অর্জিত গুণসম্পন্ন কৌশলী নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী। তবে আধুনিক এই কৌশলী নেতৃত্ব অর্জনে ব্যর্থতা খানদান পরিবারের অনেক সদস্যদের এলিটীয় মর্যাদাকেই চ্যালেঞ্জে ফেলে দেয়।

দুইটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে

০১. গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র (অতীত ও বর্তমান) তুলে ধরা; এবং

০২. গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং আবদ্ধ ও খোলা প্রশ্নের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলিট শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণকেও এ গবেষণার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর তথ্যপ্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের ওপর পরিচালিত হয়েছে। বিশালপুর ইউনিয়নের মোট আয়তন ৫৪.৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫৩টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ২৯৬২১ জন; এরমধ্যে পুরুষ ১৫৪০৫জন এবং মহিলা ১৪২১৬ জন। শিক্ষার হার ৪২%। নির্বাচিত আরেকটি ইউনিয়ন মির্জাপুরের মোট আয়তন ১৫.৫ বর্গ কিঃমিঃ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪টি। ইউনিয়নটির মোট জনসংখ্যা ৫০৭২৩ জন ; এরমধ্যে পুরুষ ২৫৪০৪ জন এবং নারী ২৫৩০৯ জন। শিক্ষার হার ৬২% (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৯)।

তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

Alice H. Amsden, Alisa Dicaprio এবং James Robison বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এলিটদের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নতুন এলিটদের আবির্ভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতি তাদের দখলে গিয়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার জন্য তাদের দায়ী করা হচ্ছে। উন্নয়ন ফলাফলের উপর এলিটদের অসমঞ্জস প্রভাব রয়েছে সেটিও দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চীনের ঘটনা সমীক্ষার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে যাতে এলিটদের

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পশ্চাতে যে গতিময়তাগুলো (Dynamics) থাকে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ থেকে এলিট এবং উন্নয়ন ফলাফলের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঁচটি দৃষ্টিকোণ হলো- ১. প্রাতিষ্ঠানিক সৃজন এবং পরিবর্তনের জন্য এলিটদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়া, ২. এলিটের গঠন এবং আবর্তনে কীভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে, ৩. এলিটদের জাতীয় কল্যাণ প্রত্যক্ষকরণ, ৪. এলিটের আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ৫. অএলিটদের সাথে এলিটেরা কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। এলিটেরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থান নিশ্চিত করতে বিশেষাধিকার ভোগ করে এবং সমাজের সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। যদিও এলিট সম্পর্কিত এই মূল্যায়নে ক্ষমতার অবস্থান নির্দেশ করে কিন্তু তার জন্য শুধু সম্পদই নয় বরং প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বপ্রসূত মর্যাদা বা পদবী। এই এলিটেরা শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়েই নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে না বরং সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তাদের বিচরণ এবং প্রভাব বিস্তারের চিত্র লক্ষণীয় (Alice H. Amsden, Alisa Dicaprio, James Robison, 2014) ।

ওপরে বিশ্লেষিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণই একজন গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে। Dube গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন যারা আর্থিক দিক থেকে অবস্থাসম্পন্ন, মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে (Dube, 1959)। Sharma গ্রামীণ এলিট বলতে সে ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন (Sharma, 1979)।

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে যারা বিভিন্ন গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিবদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন তাদেরকে এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। Schulze এবং Blumberg, Bonjean এবং Olson এবং Jennings এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন (Schulze and Blumberg ,1957; Bonjean and Olson, 1964; Jennings ,1964)। তাঁরা ঐতিহ্যিক যশস্বী (Reputational) এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি। যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাঁদের ঐতিহ্যিক যশ ধরে রাখতে না পারলেও গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। Karim রাজশাহীর দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় যশস্বী নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচীর ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি (Karim,1979)। পরবর্তীতে অবশ্য Karim অন্য এক গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Karim, 1983)। বাংলাদেশে রীতিবদ্ধ ও অরীতিবদ্ধ উভয়

ধরনের এলিটই গ্রাম জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গ্রামকে প্রভাবিত করেন। শ্রীলংকার উদীয়মান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট দলের ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যিক প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা দলসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন (Singer, 1964)। Singer-এর এ সংজ্ঞাটি থেকে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীতার জন্য নেতৃত্ব প্রবেষণ সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এ গ্রামগুলোতে যারা গ্রামের বিভিন্ন ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানিক দিক থেকে তাদের কারো যশস্বী এবং কারো অবস্থানিক ভূমিকা থাকতে পারে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয়। গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg,1959)। বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে এ দু'ধরনের পদ্ধতি অবিমিশ্র নয় বরং পদ্ধতিগত সংমিশ্রণে কখনো কখনো ভিন্নমাত্রিক নেতৃত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। এর বাইরে ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলও গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণে প্রয়োগ করা হয়।

১) অবস্থানিক (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যাঁরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি

পর্যায়ের নেতা ১২জন।

২) যশস্বী (Reputational Approach)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণির লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (Floyd Hunter, 1953)। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যাঁরা সবচাইতে বেশি মূল্য এবং সম্মান পাবেন তাঁরাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে (Karim, 1990) এবং Harjinder Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন (Harjinder Singh, 1976)। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন। ১০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে যশস্বী এবং অবস্থানিক উভয় এলিটীয় যোগ্যতার বিদ্যমানতা একই সাথে লক্ষ করা গেছে।

৩) ইস্যু পারটিসিপেশন (Issue Participation Approach)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাঁদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

নির্ণায়ক উপাদান

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নেতৃত্বের জন্য জমির মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র উপাদান নয়। এর সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শিক্ষা, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং গ্রামীণ বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার যোগ্যতার সমন্বয় ঘটলেই নেতৃত্বের অবস্থান পাওয়া যায় এবং এলিটীয় মর্যাদা অর্জিত হয়। সুতরাং যাঁরা উচ্চ বংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাঁদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাঁদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যাঁরা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিট:আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

তরুণ উদীয়মান নেতৃত্বই হোক আর আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক কিংবা ঐতিহ্যিক নেতৃত্বই হোক না কেন, গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্ব অর্জনের পশ্চাতে যে উপাদানগুলো নানাভাবে ও নানা মাত্রায় ক্রিয়াশীল তা হলো বয়স, শিক্ষা, জমির মালিকানা, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি যা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

০১. বয়স

বয়স হচ্ছে মর্যাদা নির্ধারণে সর্বজনীন নির্ধারক (Sharma, 1979: 50)। গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য বয়স চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত জরুরী। কারণ বয়স চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ঐ সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্বশীল মানুষের বয়সের গড় অনুপাত পাওয়া সম্ভব হয়। বয়স এখনো ভারতের ঐতিহ্যিক নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলতঃ বয়স হলো অভিজ্ঞতা, পরিপক্কতা এবং মনের মেজাজগত প্রশান্তির প্রতীক স্বরূপ (Rangnath, 1971: 62)। ঐতিহ্যিক সমাজে নেতৃত্বের গড় বয়স সর্বনিম্ন ২৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর হয় বলে দারশংকর লক্ষ্য

করেছেন (Darshankar, 1979: 82)।

দণ্ড চিত্র-১.১: বয়স অনুসারে গ্রামীণ এলিট

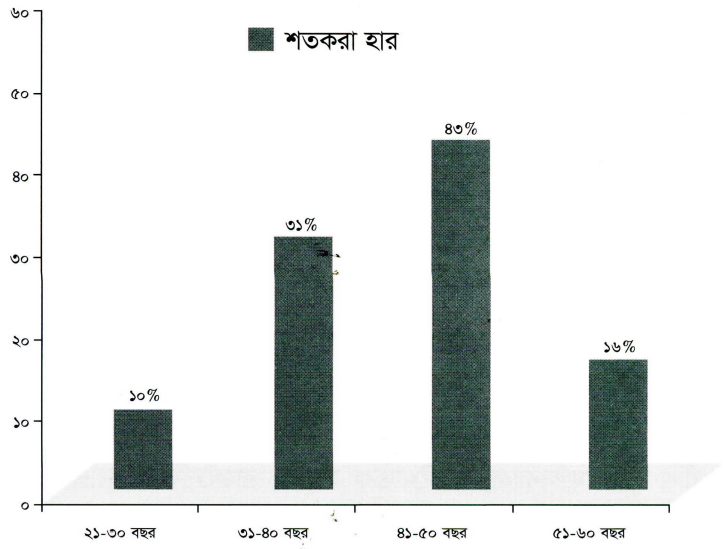

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত দণ্ড চিত্র ১.১ এ লক্ষ করা যায়, গবেষণা এলাকায় ৪১-৫০ বছর বয়স্ক এলিটের সংখ্যা ৪৩%। সমাজের নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাধান্য স্পষ্ট। সমস্যা সমাধানে এ শ্রেণির ওপর গ্রামবাসীদের নির্ভরশীলতা এবং সে বিষয়ে এলিটদের আন্তরিকতা তুলনামূলকভাবে উর্ধ্বমুখী।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজ। গ্রামীণ সমাজে যেমন ঐতিহ্য নির্ভর নেতৃত্বের প্রাধান্য রয়েছে, তেমনি উদীয়মান তারুণ্য নির্ভর নেতৃত্বের বিকাশমান ধারাও সেখানে প্রবাহমান। যে বিষয়টি করিম (১৯৯০) পুঠিয়ার দু'টি গ্রাম বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন। বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণা এলাকায় তারুণ্য নির্ভর উদীয়মান নেতৃত্বের বিকাশমান ধারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রদত্ত সারণি অনুযায়ী ৩১-৪০ বছর বয়সী এলিট ৩১%। এই শ্রেণির এলিটদের গ্রাম পর্যায়ে স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। প্রভাব চর্চার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির এলিটেরা ৪১-৫০ বছর বয়সী এলিটদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ কারণেই তারা রাজনৈতিক বিষয়ে অধিক সচেতন হতে চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের মধ্যে ভূমিকা রাখার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। সরকারি অফিসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করে। তাঁদের অফিস সংক্রান্ত এই অভিজ্ঞতা গ্রামীণ সমাজে

গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। ৫১-৬০ বছর বয়সী এলিটের সংখ্যা ৩২ জন (১৬%)। এ শ্রেণির এলিটদের মধ্যে গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। এলাকায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, উৎসব অনুষ্ঠানে মুরব্বী[১] হিসেবে তাঁরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে শোভা বর্ধন করেন। জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদেরকে সারণীতে উল্লিখিত প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী এলিট শ্রেণির কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতে দেখা যায়। ২১-৩০ বছর বয়সী এলিটদের সংখ্যা গবেষণা এলাকায় ২০ জন (১০%)। এদের অধিকাংশই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র এবং তাঁদেরকে মূলতঃ সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এই শ্রেণির এলিটেরা সামজিক অসঙ্গতির ব্যাপারে অধিক সচেতন বলে প্রতীয়মান হয়। বয়সভিত্তিক গ্রামীণ এলিটদের অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মধ্য বয়সী (৪১-৫০) গ্রামীণ এলিটদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সহিষ্ণুতায় যারা ভারসাম্যপূর্ণ। গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে এই ভারসাম্য গ্রামীণ সমাজের সংহতি রক্ষায় কার্যকর বিবেচিত হয়।

০২. শিক্ষা

শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে সম্মানজনক অবস্থান পান (Darshankar, 1979:85)। যে কোনো ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ভূমিকা হয় অগ্রগণ্য (Rangnath, 1979:108)। শিক্ষাকে নেতার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিচেনা করা হয় (Sharma, 1979:50)। বর্তমান সমাজে সম্প্রদায়ের ইস্যু এবং সমস্যা সম্পর্কে বোঝার সামর্থ্য এবং অন্যের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় নেতৃত্বের অন্যতম গুণাবলী (Darshankar, 1979:84-85)। শিক্ষা হলো সে সামর্থ্য অর্জনের উপায়। নেতৃত্বের সাবলীল বিকাশের জন্য শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। গ্রামীণ এলিটেরা যেহেতু গ্রাম সমাজে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তাই শিক্ষা তাঁদের প্রাপ্তব্য মর্যাদাকে যুগোপযোগী করে তোলে। শিক্ষা গ্রামীণ এলিটদের মর্যাদার অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Wahab, 1980:84; Rumi, 1985:57; Karim, 1990)। শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামের সাধারণ মানুষের চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, অফিস-আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্রাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পরিদর্শনে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গ্রামের মুখপাত্র হিসেবে আলোচনা করেন।

১ স্থানীয়ভাবে বয়োজ্যেষ্টদের মুরব্বী বলে সম্বোধন করা হয়।

দণ্ড চিত্র ১.২: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে গ্রামীণ এলিট

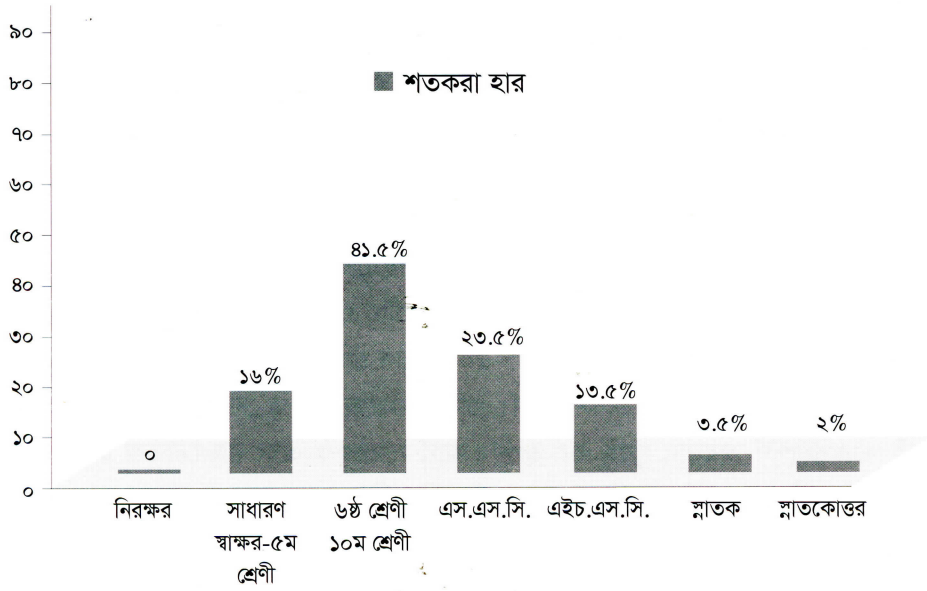

সূত্র: মাঠ জরিপ

দণ্ড চিত্র ১.২-এ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বর্তমান গবেষণা এলাকায় কোনো নিরক্ষর গ্রামীণ এলিট নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে সাধারণ সাক্ষর থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এলিটদের সংখ্যা ৩২ জন (১৬%)। এসব গ্রামীণ এলিটদের সকলেই বয়স্ক কৃষক শ্রেণির গ্রামীণ এলিট। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব গ্রাম সমাজে তাঁদের ভূমিকা রাখার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছে। যদিও রক্তের সম্পর্ক সমাজে এখনো তাঁদের সম্মানের অবস্থানকে ধরে রেখেছে, কিন্তু এতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাই এই শ্রেণির এলিটেরা নিজেদের পরিবর্তে গ্রামীণ সমাজে সন্তানদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে মনোযোগী হয়েছেন লক্ষ করা যায়। ৬ষ্ঠ-১০তম শ্রেণির শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেশি (৪১%) এবং গ্রাম পর্যায়ে এসব এলিটের প্রভাবশালী ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আবার এ শ্রেণির এলিটদের বয়সও ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। বয়সের গড়ে যেমন তাদের সংখ্যা অধিক, তেমনি শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেও তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এস.এস.সি. পাশ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা ৪৭ (২৩.৫%)। এসব গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে উদীয়মান এলিট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁরা মূলতঃ গ্রামের আনুষ্ঠানিক (ইউপি, সমবায় সমিতির নেতৃত্ব প্রভৃতি) নেতৃত্বের প্রতি অধিক মনোযোগী। এ জন্য তাঁরা গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেন। এইচ.এস.সি.

পাশ এলিটদের সংখ্যা ২৭জন (১৩.৫%)। এ শ্রেণির এলিটদের বেশিরভাগই বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকুরিরত। শিক্ষার উন্নয়নে এ শ্রেণির এলিটদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁরা গ্রাম সমাজে চাকরিজীবী হিসেবে যথেষ্ট সম্মানিত। গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন যাঁদের সংখ্যা ৭ জন (৩.৫%) এবং ৪ জন (২%)। কারণ তাঁরা সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং তাদের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের বেশিরভাগই বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কলেজ-মাদ্রাসার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। বর্তমান গবেষণা এলাকায় উচ্চ শিক্ষার হার যদিও কম তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, নির্বাচিত সকল এলিটই সাক্ষর অর্থাৎ সাক্ষরতার হার শতকরা একশত ভাগ, যেখানে বগুড়া জেলার সাক্ষরতার হার ৪৯.৪% এবং শেরপুর উপজেলার সাক্ষরতার হার ৪৪.১% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২)। সর্বোপরি সারা দেশের সাক্ষরতার হার (৭+) ৭২.৯% (প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বও, ২০১৮)। শিক্ষার প্রতি গ্রামীণ এলিটদের ইতিবাচক মনোভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় এলাকায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যেকোনো উদ্যোগ এবং ভূমিকায় তাঁরা কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকেন। তাঁদের এই অবস্থান অনুসারিদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করে। শিক্ষার প্রতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রেণি নির্বিশেষে ইতিবাচক মনোভাব সেই বাস্তবতারই বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করা যায়।

০৩. বসতবাড়ি

বসতবাড়ীর ঐতিহ্য গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব এবং নেতৃত্ব ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে (Rumi 1985:62)। Karim এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঐতিহ্যিক এসব গ্রামীণ এলিটেরা সুদীর্ঘকালব্যাপী বংশীয় মর্যাদার ভিত্তিতে গ্রাম সমাজকে অরীতিবদ্ধভাবে পরিচালিত করে আসছে (Karim,1990)। উদাহরণস্বরূপ বিশালপুর ইউনিয়নের দুবলাই গ্রামের হাজী বাড়ি, পেঁচুল গ্রামের খাঁ (খান) বাড়ি, কচুয়াপাড়া গ্রামের সরকার বাড়ি এবং মির্জাপুর ইউনিয়নের উচরং গ্রামের সরকার বাড়ির কথা উল্লেখ করা যায়। এ বাড়িগুলো শুধুমাত্র উপরোক্ত গ্রামগুলোতেই নয় আশেপাশের এলাকায়ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এসব বাড়ির সদস্যরাও বাড়ির নামানুসার সম্বোধিত হয়ে থাকেন যেমন হাজী বাড়ির ছেলে, সরকার বাড়ি ছেলে, খাঁ (খান) বাড়ির ছেলে অথবা সরকার বাড়ির ছেলে।

বাড়ি কথাটা দিয়ে গ্রামবাসী কখনো কখনো বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন পরিবার, ঘর, গোষ্ঠী ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে (রহমান, ১৯৯৯: ৬২)। তাছাড়া বেশি সদস্য এবং অধিক সম্পত্তির মালিকানা খানদান (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) পরিবারের প্রতীক (Rumi, 1985: 62)। কিন্তু গবেষণা এলাকায়

অধিক সম্পত্তি খানদানের প্রতীক বলে বিবেচিত হলেও, অধিক সদস্য খানদান প্রতীক নির্দেশ করে না। কারণ গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষণীয় নয়, বরং একক পরিবারের প্রবণতা স্পষ্ট। তারপরও গ্রাম পর্যায়ে খানদান পরিবারগুলো যৌথ থেকে একক পরিবারে রূপ নিলেও ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা যৌথ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া প্রতিটি খানদান বাড়ির প্রধান ব্যক্তি গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হন (Rumi, 1985: 62)। তারপরও তাঁরা বংশের জীবিত জ্যেষ্ঠ মানুষের প্রভাব চর্চায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং অনেক সময় একটি খানদান বংশের বাড়িকে কেন্দ্র করে পাড়া {একাধিক কাছাকাছি ঘর নিয়ে কোনা, কতকগুলো কোনা নিয়ে বাড়ি এবং কতকগুলো বাড়ি নিয়ে গঠিত হয় পাড়া (রহমান, ১৯৯৯:৬৩)} সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন দুবলাই গ্রামের হাজী বাড়ি থেকে হাজী পাড়ায় রূপান্তর, কচুয়াপাড়ার সরকার বাড়ি থেকে সরকার পাড়ায়, প্রামানিক বাড়ি থেকে প্রামানিক পাড়ায়, পেঁচুল গ্রামের খাঁ বাড়ি থেকে খাঁ পাড়ায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। এসব পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বংশের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। মুরব্বী বা বয়স্ক শ্রেণির এসব গ্রামীণ এলিটেরা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ঐসব অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করে থাকেন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে নির্দিষ্ট বংশের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বয়সে তরুণ এলিটেরা গ্রামীণ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে এবং ক্ষমতা কাঠামোয় স্পষ্টতঃ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। ঐসব এলিটেরা নির্দিষ্ট পাড়ার বিভিন্ন বাড়ির প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। বংশ-প্রধান মুরব্বীরা এসব ব্যাপারে তাঁদের ওপর আস্থা রাখেন।

বাড়ির প্রধান এসব গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাড়ির গঠনগত ধরন থেকেও গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকানার ধরন বসতবাড়ি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে (Jahangir, 1979)। গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে যাঁরা অধিক ভূমির মালিক (ধনীকৃষক) এবং যাঁরা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল তাদের বাড়ির আয়তন তুলনামূলক অন্যান্য গ্রামবাসীর বাড়ির আয়তনের চেয়ে বড়। বাড়ির গঠনগত দিক দিয়েও এ পার্থক্য দেখা যায়। অতীতে বর্তমান গবেষণা এলাকায় সকল গ্রামীণ এলিটের বসতবাড়ী কাঁচা মাটির তৈরি দেখা গেলেও বর্তমানে তাঁদের মধ্যে ইটের পাকা বাড়ি তৈরি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। বাড়ির ধরন অনুযায়ী এ সকল বাড়ির অধিকাংশেই কয়েকটি ঘর ছাড়াও একটি বৈঠকখানা রয়েছে। বৈঠকখানাকে এলিটদের মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে দেখা হয় (চৌধুরী, ২০০৩:৩৭)। তবে অনেক গ্রামীণ এলিট পরিবারই এ বৈঠকখানাকে অবিবাহিত সন্তানদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। দণ্ডচিত্র ১.৩ এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটদের বসত বাড়ির ঘরের সংখ্যা জানা যাবে:

দণ্ড চিত্র-১.৩: ঘরের মালিকানা অনুসারে গ্রামীণ এলিট

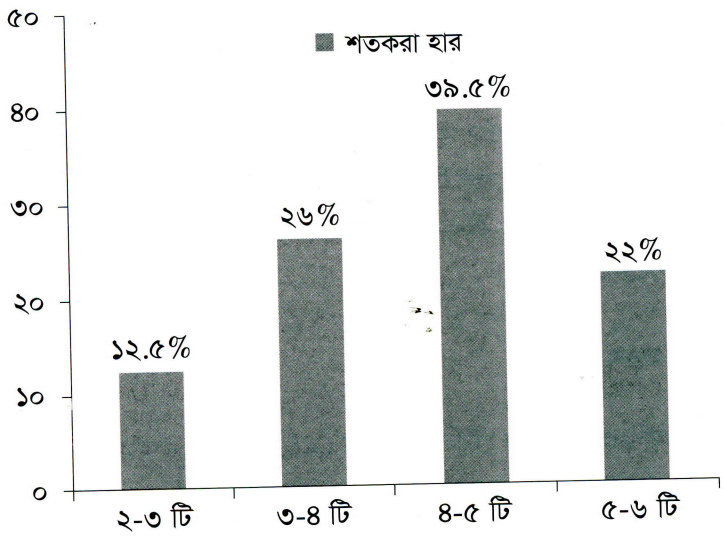

সূত্র: মাঠ জরিপ

দণ্ড চিত্র-১.৩ এ দেখা যায়, বর্তমান গবেষণা এলাকায় ৪-৫টি ঘর বিশিষ্ট বাড়ি রয়েছে যার শতকরা হার ৩৯.৫ ভাগ গ্রামীণ এলিটের। এ শ্রেণির এলিটদের অধিক পরিমাণ জমির মালিকানা রয়েছে। এসব গ্রামীণ এলিটেরা বাড়ির ঘরগুলোকে বসবাসের পাশাপাশি শস্য সংরক্ষণের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও শস্য সংরক্ষণের জন্য তাদের আলাদা গোলাঘর থাকে। এসব বাড়ির ৪টি ঘর বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও একটি ঘর বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বৈঠকখানার পূর্বের গঠনগত রূপের সাথে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যা চৌধুরী ({বাংলায়} ২০০৩) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন। বর্তমানে বৈঠকখানা মূলবাড়ির অন্দর মহলেই অবস্থিত হয়ে থাকে এবং অন্যান্য ঘরের সাথে এর গঠনগত কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। ৩-৪টি ঘরবিশিষ্ট বসতবাড়ী রয়েছে ৫২ জন এলিটের (২৬%)। এ ধরনের বসতবাড়ী ইটের পাকা বাড়ি এবং এতে এলিটেরা একক পরিবার হিসেবে বসবাস করে থাকেন। মোট ৪৪ জন (২২%) গ্রামীণ এলিটের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ৫-৬টি। এসব বাড়িতে সাধারণতঃ যৌথ পরিবারের বসবাস। এসব বাড়ির প্রধানরা গ্রাম পর্যায়ে অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। ২-৩ টি ঘরবিশিষ্ট বসতবাড়ির সংখ্যা ২০টি (১০%)। সাধারণতঃ যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠন করলেও এর সদস্যরা যৌথ পরিবারের বাড়িতেই ২-৩টি ঘর ভাগাভাগি করে নিয়ে বসবাস করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার, পাকা বাড়ি এবং গ্রামের মধ্যবর্তী অবস্থান এলিটদের মর্যাদাকে প্রভাবিত করে। অতীতে গবেষণা এলাকায় এলিটেরা মাটির বাড়ি তৈরি করলেও বর্তমানে ইটের পাকা বাড়ি করার প্রবণতা লক্ষণীয়, যেটি পূর্বেই উল্লেখ

করা হয়েছে। ইটের বাড়ি তৈরির প্রবণতা গ্রামীণ বসত বাড়ির কাঠামোগত অবস্থানে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। বসতবাড়ি সংক্রান্ত কাঠামোগত এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথিকৃত গ্রামীণ এলিট শ্রেণি। বসত বাড়ি সম্পর্কে তাদের নতুন এ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তাঁদের অনুসারীরাও সমানভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছে যেটি গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যেকোনো ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ এলিটদের ইতিবাচক মনোভাব গ্রামীণ সমাজে তাঁদেরকে আধুনিকতার এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরীসহ গ্রামীণ জীবনকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে তাঁদের ভূমিকাকে তাই তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা যায়।

০৪. পরিবারের ধরণ

পরিবার হলো সামাজিক জীবনের মৌলিক একক (Afsaruddin, 1964:12)। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর পরিবারের প্রকারভেদ অনুসারে পরিবার একক এবং যৌথ এ দু'ভাগে বিভক্ত। একক পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত পরিবারকে বোঝায়। আর যৌথ পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা, পিতা ও মাতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, স্বামীর ভ্রাতা ও তাঁদের স্ব-স্ব স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা অন্তর্ভুক্ত থাকেন (খান, ১৯৮০:২২৭)। গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

পাই চিত্র-১.১: পরিবারের ধরণ অনুসারে গ্রামীণ এলিট

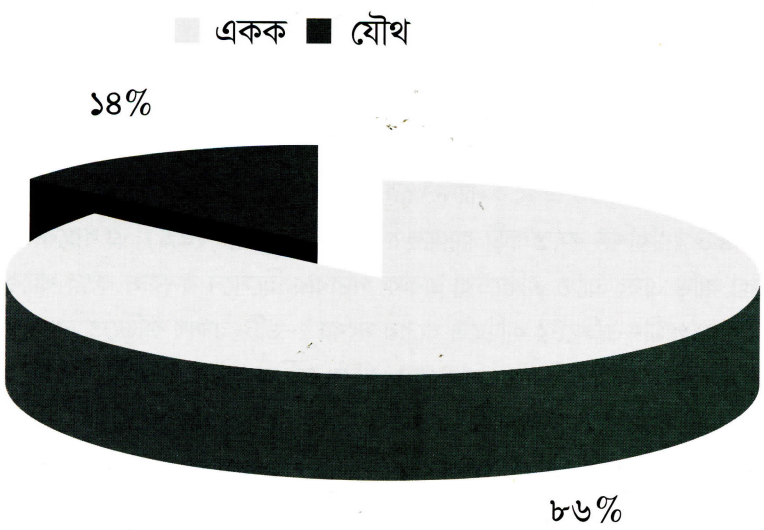

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত পাই চিত্র ১.১ এ দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের পরিবারের মধ্যে যৌথ পরিবার ২৮টি (১৪%) এবং একক পরিবার ১৭২টি (৮৬%)। উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, বর্তমান গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ও ব্যাপক নয় বরং একক পরিবারের প্রবণতা স্পষ্ট। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকে আছে। যে গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জমিজমাসহ সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তাঁরাই কেবল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এসব পরিবারের অন্য সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত। তবে পারিবারিক ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে তাঁরা পরিবারের উদ্বৃত্ত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। যদিও যৌথ পরিবারের বহুমুখী সুবিধা রয়েছে। যৌথ পরিবার গ্রামীণ এলিটদের ব্যাপক প্রভাবশালী করে থাকে এবং গ্রামের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে থাকে, তারপরও যৌথ পরিবারের তরুণ সদস্যরা একক পরিবার গঠনের মনোভাবই পোষণ করেন।

গবেষণা এলাকায় একক পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও গ্রামীণ সমাজে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা একই একক (ইউনিট) হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেই একক যে সব সময় কার্যকর এবং প্রাণবন্ত থাকে তা নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে অনৈক্য তৈরি হয় এবং সেই অনৈক্য গ্রামীণ সমাজে তাদের প্রভাবকে সংকুচিত করে ফেলে। এতে তাঁদের এলিটীয় মর্যাদাও হুমকীর মধ্যে পড়ে যায়।

০৫. বংশ মর্যাদা

গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠীর (মূলতঃ পিতৃ-ধারায় {Patrilineal} জ্ঞাতিরা যারা একই পূর্ব পুরুষ {Common male ancestor} থেকে নিম্নধাবিত {decendent} তারাই গোষ্ঠীর সদস্য বলে পরিচিত। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এ গোষ্ঠীর সদস্য বলে গণ্য হয় [রহমান, ১৯৯৯:৫৬]) পরিবর্তে আরো একটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় সেটি হলো বংশ। অধিকাংশ গবেষক এ শব্দদ্বয়কে একই অর্থে এবং একটিকে অন্যটির প্রতিশব্দ হিসেবে মনে করেছেন (রহমান, ১৯৯৯: ৫৮)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বংশ মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে বংশের আকার যেমন এক রকম হয় না তেমনি ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকেও বংশের বিভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন উপাদান বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদার বিভিন্নতা নিরূপণ করে। এ উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি, শিক্ষা, বৈবাহিক সম্পর্ক, উচ্চতর প্রভাব (যেমন প্রশাসন, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতিতে প্রভাব থাকে) ইত্যাদি (রহমান, ১৯৯৯: ৫৯)।

জীবনযাপন প্রণালীর বিভিন্নতা, শিক্ষা, সম্পদ, জমির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রধানতঃ এ দেশের গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠী স্তরায়িত (চৌধুরী, ২০০৩: ৬৬)। বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণা এলাকার মানুষের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাস হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে চৌধুরী বর্ণিত সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান (চৌধুরী, ২০০৩:৬৭) কিংবা বার্টোসি (বাংলায়) বর্ণিত মজুমদার, ভুঁইয়া, চৌধুরী, মহিষান, কাজী, মুন্সী (বার্টোসি, ১৯৯২:৭৪) পদবীর বংশের উপস্থিতি দেখা যায় না। বর্তমান গবেষণা এলাকায় প্রামাণিক, সরকার, খান, মণ্ডল, আকন্দ পদবীর বংশের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। উপরোক্ত বংশগুলোই গবেষণা এলাকায় আশরাফ (বার্টোসি, ১৯৯২:৬১) বা খান্দান (চৌধুরী, ২০০৩:৬৯) বংশ হিসেবে পরিচিত। গবেষণা এলাকায় জমির মালিকানার সাথে সাথে বংশ মর্যাদার সমন্বয় সামাজিক মর্যাদার অবস্থান দখল করতে সাহায্য করে। তাই বংশ মর্যাদার প্রভাব পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই। বংশ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রামীণ এলিটেরা গ্রাম পর্যায়ে তাদের প্রভাব বলয় অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে থাকেন। গবেষণা এলাকার সকল গ্রামীণ এলিট উপরোক্ত বংশীয় পদবীর অধিকারী যা দণ্ড চিত্র ১.৪-এ দেখানো হলো:

দণ্ড চিত্র-১.৪: বংশীয় পদবীর ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

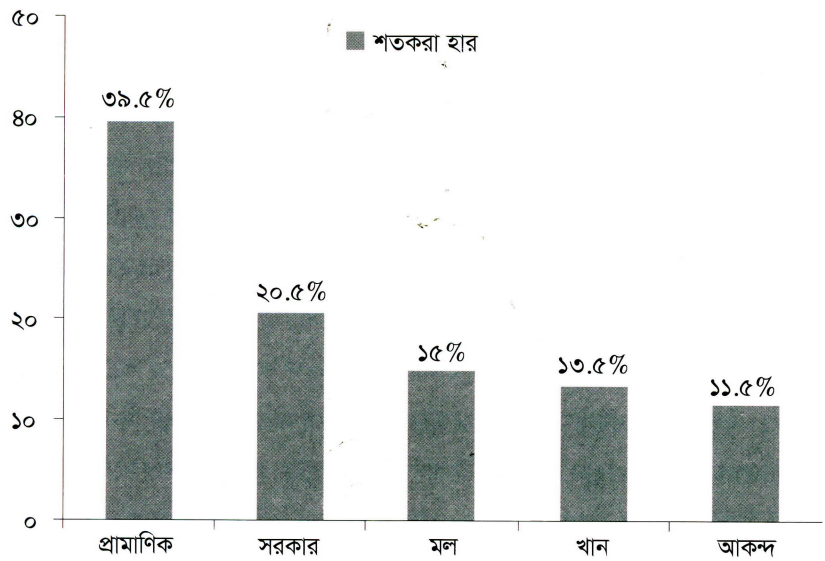

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত দণ্ড চিত্র ১.৪ লক্ষ করা যায়, গবেষণা এলাকায় প্রামাণিক বংশের গ্রামীণ এলিট অপেক্ষাকৃত

বেশি যার সংখ্যা ৭৯ জন (৩৯.৫%)। এ ছাড়া সরকার শ্রেণির গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ৪১ জন (২০.৫%), খান বংশ মর্যাদার এলিটের সংখ্যা ২৭ জন (১৩.৫%), মণ্ডল বংশের গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ৩০ জন (১৫%) এবং আকন্দ বংশের গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা ২৩ জন (১১.৫%)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অতীতের ন্যায় গ্রামীণ সমাজে প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদার জন্য বংশের প্রভাব ততোটা কার্যকর নয়। অর্থনৈতিক সক্ষমতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং ভূমিকা রাখার যোগ্যতা না থাকলে শুধুমাত্র বংশ মর্যাদায় এলিটীয় মর্যাদা অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো স্থানীয় এলাকায় প্রভাবশালী বংশের সদস্যরাই এলিটীয় মর্যাদা অর্জনের উপরোক্ত গুণ অর্জনে তৎপর এবং সক্ষমও বটে।

গ্রামীণ এলিটদের অর্থনৈতিক অবস্থা

নেতা ও নেতৃত্ব সব সময় সমাজের ধনীক শ্রেণির পরিবার থেকে আসে বলে সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। অর্থনৈতিক মর্যাদা গ্রামীণ নেতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বংশ নয় বরং অনেকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারেন (Rangnath, 1968:92)। মূলতঃ ক্ষমতা এবং সম্পদ একে অপরের পরিপূরক। Darshankar (1979) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, 'প্রত্যেক নেতাই তাঁর পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কারণেই তাদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন' (Darshankar, 1979:90)। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদেরও নেতৃত্ব, মর্যাদা এবং ক্ষমতা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।

০১. ভূমি মালিকানা

গ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রামীণ ভারতের ভূমি মালিকানার ধরন অনুযায়ী চাষযোগ্য জমির অধিকাংশই একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক বৃহৎ মালিকদের হাতে পুঞ্জিভূত (Sirsikar, 1970:72)। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার ধরনও একই। বাংলাদেশের ৫০ ভাগ জমি এসব অল্প সংখ্যক গ্রামীণ এলিটদের হাতে পুঞ্জিভূত (Rumi, 1985:7)। বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা এবং জমির সাথে সম্পর্ক সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির মাঝে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (বার্তোসি, ১৯৯২:৫৬)। তাই গ্রামীণ এলাকায় এলিট মর্যাদা প্রাপ্তিতে জমি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মূলতঃ জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি (বার্তোসি, ১৯৯২:৫৬)। জমির মালিকানা হলো ক্ষমতার প্রাথমিক উৎস। এটি সবচেয়ে দৃশ্যমান সম্পদ এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে তা ব্যক্তির মর্যাদার সাথে জড়িত (Karim, 1990:80)। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক

অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের জমির পরিমাণ অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জমির মালিকানার ধরন অনুযায়ী গবেষণা এলাকায় কয়েক শ্রেণির ভূমি মালিক গ্রামীণ এলিটের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ক) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১৫-২০ একর জমির মালিক তাঁরা গবেষণা এলাকায় খুব ধনী (বড় গেরস্থ) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

খ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১০-১৫ একর জমির মালিক তাঁরা ধনী কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

গ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ৫-১০ একর জমির মালিক তাঁরা মধ্যবিত্ত কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

ঘ) যে গ্রামীণ এলিটেরা ১-৫ একর জমির মালিক তাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

পাই চিত্র-১.২: জমির মালিকানা অনুযায়ী গ্রামীণ এলিট

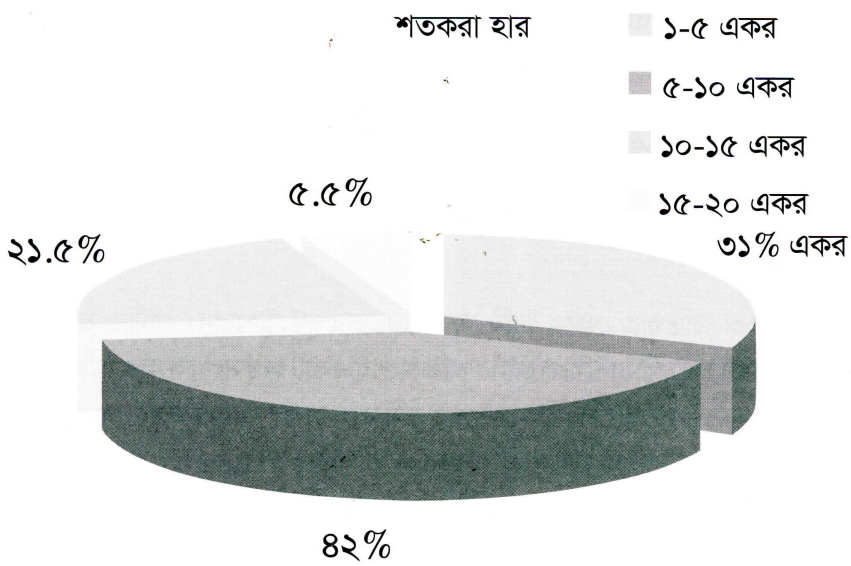

সূত্র: মাঠ জরিপ

৫-১০ একর জমির মালিক শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা গবেষণা এলাকায় অধিক (৪২%)। মূলতঃ এ শ্রেণির এলিটেরা ধনী কৃষক শ্রেণির বংশধর। বিবাহের পর একক পরিবার গঠন করায়

জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে তাঁরা মধ্যবিত্ত কৃষকে পরিণত হয়েছেন। গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্যগত প্রভাব চর্চায় যথেষ্ট সচেতন এ শ্রেণির এলিটেরা বংশগতভাবে সে প্রভাব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ। গবেষণা এলাকায় ১০-১৫ একর জমির মালিক শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ৪৩ জন (২১.৫%)। এ শ্রেণির এলিটেরা গবেষণা এলাকায় ধনী কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এসব এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং অনেকদিন যাবৎ একক পরিবার রক্ষা করায় এবং কোনো সন্তানের বিবাহ না দেয়ায় তাঁদের জমির পরিমাণ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা এলাকায় ১৫-২০ একর জমির মালিক শ্রেণির এলিটেরা খুব ধনী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এ শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ১১ জন (৫.৫%)। যে এলিটেরা এখনো যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরিবারের পুত্র সন্তানেরা বিবাহ করার পরও পিতা মাতার সাথে যৌথ পরিবারে একত্রে বসবাস করছেন তারাই এতো অধিক পরিমাণ জমির মালিকানা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ১-৫ একর জমির মালিক শ্রেণির কৃষকেরা মূলতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৃষক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এ শ্রেণির এলিটের সংখ্যা ৬২ জন (৩১%)। যাঁরা এক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৃষক ছিলেন কিন্তু পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তারা জমির কিছু অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হন। এর ফলে তাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষকে পরিণত হয়েছেন। এ শ্রেণির গ্রামীণ এলিটেরা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের প্রভাব ধরে রাখতে তৎপর। বংশ মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকায় তাঁরা নিজ প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম হন বলে গবেষণা এলাকায় প্রতীয়মান হয়েছে। তবে এ শ্রেণির এলিটেরা অর্থনৈতিকভাবে যতো দুর্বল হতে থাকেন তাঁদের প্রভাবও ততো হ্রাস পেতে থাকে। ভূমি মালিকানা যেহেতু গ্রামীণ নেতৃত্বের ঐতিহ্যিক উপাদান সেহেতু গ্রামীণ এলিটেরা ভূমি মালিকানা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। আর এ কারণেই জমির ওপর চাপ হ্রাস করার জন্য নিরীক্ষিত এলিটদের কেউ কেউ স্থানীয় হাট-বাজারে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করেন। এতে তাঁদের আর্থিক সমৃদ্ধি যেমন আসে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে মর্যাদাও বৃদ্ধি হয়। গ্রামীণ সমাজে সরকারি-বেসরকারি চাকুরির বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। অতীতে চাকুরির বিষয়ে গবেষণা এলাকার এলিটদের উদাসীনতা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে চাকুরির বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। নিজ নিজ সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়ে যেমন তাঁরা আন্তরিক, ঠিক তেমনি স্থানীয় এলাকার বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে তাঁরা ব্যাপক আগ্রহী। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি স্থানীয় এলাকায় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের এ ধরনের মনোভাব তৈরি হতে পারে। আর এ কারণেই সন্তানদের চাকুরির জন্য এলিটেরা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব যেমন ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তেমনি ঘুষ প্রদানেও দ্বিধা করেন না। এ ধরনের প্রবণতা গ্রামীণ জীবনে ঘুষ-দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি করেছে দাবি করা যায়।

০২. বাৎসরিক আয়

যে কোনো মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে উপার্জন একটি অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Rumi, ১৯৮৫:৬৪)। মূলতঃ গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক মর্যাদার জন্য উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বর্তমান গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমান গবেষণা এলাকায় উপার্জনের ভিত্তিতে এলিটদের সুবিধাজনক অবস্থান লক্ষ করা যায়। এটা সর্বজনবিদিত এবং গ্রাম গবেষকদের দ্বারাও সমর্থিত যে, বাংলাদেশের গ্রামসমূহে মানুষের প্রধান পেশা কৃষি (রহমান,১৯৯৯)। এ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সচল রাখতে গবেষণা এলাকায় কৃষি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তির এ ব্যবহার সর্বপ্রথম গ্রামীণ এলিটদের হাত ধরেই আসে। যেমন পাওয়ার ট্রিলার, শ্যালো মেশিন, ট্রাক্টর, ধান মাড়াইয়ের মেশিনের ব্যবহার প্রভৃতি। এ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তাদের উপার্জনের চাকাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আয় এবং ব্যয়ের সঠিক হিসেব তাদের কাছে না থাকায় গ্রামীণ এলিটদের আয়ের প্রকৃত পরিসংখ্যান বের করা কঠিন। তবে গ্রামীণ এলিটদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের আয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

পাই চিত্র-১.৩: বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

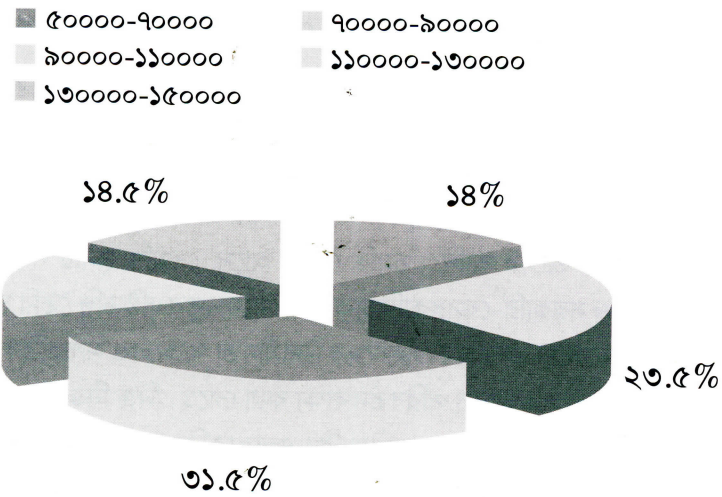

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র (১.৩) হতে দেখা যায়, গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ২৯ জন খুব ধনী শ্রেণির এলিট যার শতকরা হার ১৪.৫ ভাগ, ৩৩ জন এলিট ধনী শ্রেণির যার শতকরা হার ১৬.৫ ভাগ, ৬৩ জন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির যার শতকরা হার ৩১.৫ ভাগ, ৪৭ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণির যার

শতকরা হার ২৩.৫ ভাগ এবং ২৮ জন নিম্নমধ্য শ্রেণির এলিট যার শতকরা হার ১৪ ভাগ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। যার গড় শতকরা হার ৩১.৫ ভাগ। এসব গ্রামীণ এলিটের অধিকাংশই উদ্বৃত্ত কৃষক, যারা উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয়ের অর্থে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে থাকেন। বিশেষ করে মন্দা মৌসুমে এসব এলিট উদ্বৃত্ত ফসল থেকে প্রাপ্ত উপার্জন দ্বারা প্রাত্যহিক আয়-ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। এ সময় গ্রামীণ এলিটেরা দিনমজুর এবং প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ প্রদান করেন বলে করিম যে চিত্র দেখিয়েছেন (Karim, 1990:52), এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের কারণে গবেষণা এলাকায় সে প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামীণ এলিটদের এ উদ্বৃত্ত টাকা গ্রাম পর্যায়ে অনেক সময় সার এবং কীটনাশক মজুদের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বলে রুমি দেখিয়েছেন (Rumi, 1985:64) এবং এ ধরণের 'সার ও কীটনাশক মজুদ' সমস্যা বর্তমান গবেষণা এলাকায়ও লক্ষণীয়। এতে প্রান্তিক কৃষকেরা প্রয়োজনীয় সারের অভাবে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির জন্য সরকারের পদক্ষেপ এবং সার ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের মানসিকতাও সমানভাবে দায়ী।

উদ্বৃত্ত অর্থ এসব গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠায়ও ব্যবহার করে থাকেন। ক্লাব, সমিতি, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির অথবা খেলাধুলার প্রয়োজনে বস্তুগত এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এটি করে থাকেন। তবে সব সময় যে আর্থিক সক্ষমতা প্রভাব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর হয় তা-ও না। শিক্ষা, সচেতনতা, রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং নেতৃত্বের কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমেও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত গুণের অভাবে আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অনেক সময় বুদ্ধিমান এলিটদের অনুসারিতে পরিণত হতে বাধ্য হন। আর্থিক বিবেচনায় গবেষণা এলাকার এলিটদের অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদা অবশ্যই ভালো বলে বিবেচনা করা যায়।

০৩. সম্পত্তির মালিকানা

মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা অনেকটা সম্পত্তির মালিকানার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি মালিকানা বাদে সম্পত্তি থেকে উপার্জন এবং সম্পত্তির মূল্য সামাজিক মর্যাদার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক (Darshankar, 1979: 94)। কারণ গ্রাম পর্যায়ে সম্পত্তি প্রভাব প্রতিষ্ঠায় অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয় (Rumi, 1985:69)। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রামীণ এলিটেরা নিজ এলাকায় পর্যাপ্ত সম্পত্তির মালিক এবং অধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

পাই চিত্র-১.৪: সম্পত্তির মূল্যমান অনুযায়ী এলিট

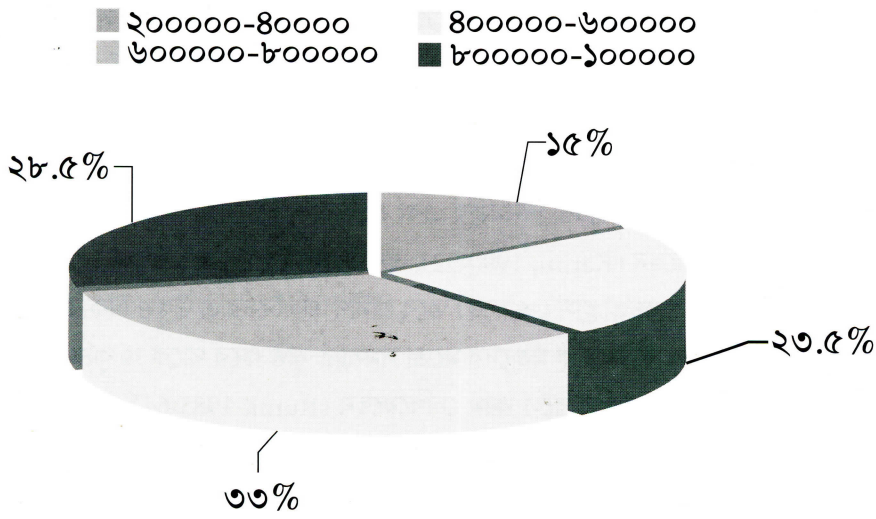

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র-১.৪-এ গ্রামীণ এলিটদের মোট সম্পদের মূল্যমান দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতা এলিটদের মধ্যে অধিকাংশই এ তথ্য প্রদান করতে খানিকটা দ্বিধা এবং সংকোচ প্রকাশ করেন। তবে গবেষকের উদ্দেশ্য বোঝানোর পর তাঁরা যে তথ্য প্রদান করেন তাও অনেকটা অনুমান নির্ভর। দণ্ড চিত্র ১.৪ অনুসারে ৬৬ জন এলিটের (৩৩%) সম্পদের মূল্য ৬,০০,০০০-৮,০০,০০০ টাকা বর্তমান গবেষণা এলাকায় যাদের সংখ্যা অধিক। ৫৭ জন এলিটের (২৮.৫%) সম্পদের মূল্য ৮,০০,০০০-১০,০০,০০০ টাকা। ৪৭ জন এলিটের (২৩.৫%) সম্পদের মূল্য ৪,০০,০০০-৬,০০,০০০ টাকা। ৩০ জন এলিটের (১৫%) সম্পদের মূল্য ২,০০,০০০-৪,০০,০০০ টাকা। গ্রামীণ এলিটদের সম্পত্তির গড় মূল্যমান ৬,৫০,০০০ টাকা। এ ছাড়াও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের মালিকানার ওপরও সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল। অর্থাৎ ভূমি মালিকানা এবং সম্পত্তির উপার্জন বাদেও বস্তুগত অন্যান্য সম্পদও এলিটদের মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (Darshankar, 1979:94)। যেমন মোটর সাইকেল, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, পাওয়ার ট্রিলার, শ্যালো মেশিন প্রভৃতির মালিকানা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু পাওয়ার ট্রিলার উন্নত কৃষি প্রযুক্তির নিদর্শন , তাই এর মালিকানা প্রতিজন গ্রামীণ এলিটের কাম্য। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় সকল গ্রামীণ এলিটই পাওয়ার ট্রিলারের মালিক নন। যেসব গ্রামীণ এলিট পাওয়ার ট্রিলারের মালিক তাঁরা গ্রামবাসীর কাছ থেকে অতিরিক্ত মর্যাদা পেয়ে থাকেন। কারণ জমি চাষাবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে এসব ট্রিলার মালিকের ওপর অনেক গ্রামবাসীকেই নির্ভর করতে হয়। এছাড়া মোটর সাইকেল স্পষ্টতঃই গ্রাম পর্যায়ে উদীয়মান এলিটদের প্রভাবশালী

হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব এলিট যাতায়াতের সহজ মাধ্যম মোটর সাইকেলের মালিক হওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে থাকেন। মোবাইল ফোন গ্রাম পর্যায়ে মর্যাদার জন্য গুরত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। শহরমুখী যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে অনুসারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মোবাইল ফোন অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া টেলিভিশনের মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এসব এলিট নিয়মিত সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করার মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন এবং এ সচেতনতা তাঁদেরকে গ্রাম পর্যায়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে সহায়তা করে থাকে। ফ্রিজের মালিকানাও অনুসারিদের ওপর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর বিবেচিত হয়। যদিও পাওয়ার ট্রিলার এবং মোটর সাইকেলের মালিক এলিটদের সংখ্যা কম কিন্তু তাঁদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তবে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ এলিটই মোবাইল ফোন ও টেলিভিশনের মালিক। রঙ্গীন টেলিভিশন অধিক মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এলিটদের মধ্যে কেউ কউ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অথবা সন্তানদের পড়ালেখার অজুহাতে টেলিভিশন ক্রয় করা থেকে বিরত রয়েছেন বলে দাবি করেন। অবশ্য তারাও চিত্তবিনোদনের জন্য রেডিও ব্যবহার করে থাকেন। রেডিও'র প্রচলন দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং রেডিও এখন অবশ্যই মর্যাদার নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয় না। এক সময় বাই সাইকেল এবং রেডিওকে (Darshankar, 1979:92, Rumi, 1985:7) গ্রামীণ এলিট মর্যাদার নির্ধারক মনে করা হতো। সময়ের বিবর্তনে এগুলো মোটেও আর মর্যাদার প্রতীক নয়। আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে এগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিকতামুখী। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতা গ্রামীণ এলিটদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের যুগোপযোগী এবং আধুনিক করার মানসে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে নিজেদের অভ্যস্থ করেন। তাদের এ ধরনের অভ্যাস অনুসারীদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। আর এভাবেই গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতা প্রবেশ করে।

০৫. পেশা

পেশা জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বলা যায়, পেশার ধরনের সাথে জীবনমান তথা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাও প্রতিফলিত হয় (রূপা, ২০০৫:৫৯)। যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য তার পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার (Factor) (Whahab, 1980:89)। তাই যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা জানার জন্য তাঁর পেশার ধরণ জানা আবশ্যকীয় (Rumi, 1985:7)। গ্রামাঞ্চলে কৃষিই প্রধান পেশা (Darshankar, 1979; Jahangir, 1979; Sharma, 1979; Karim, 1990; চৌধুরী, ২০০৩)। গ্রামীণ এলিটদেরও মূল পেশা কৃষি (Whahab, 1980:89)। কিছু কিছু গ্রামীণ এলিট

অন্যান্য পেশায়ও জড়িত তবে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং এ ধরনের গ্রামীণ এলিটেরা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানুষের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি (বার্টোসী, ১৯৯২:৫৬)। বর্তমান গবেষণা এলাকায়ও জমির মালিকানা নিঃসন্দেহে মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবে তা একমাত্র নয়। সরকারি-বেসরকারি চাকুরি, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, আর্থিক সক্ষমতা এবং ব্যবসাও গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদার জন্য ভূমিকা রাখে।

পাই চিত্র নং-১.৫ পেশা ধরন অনুসারে গ্রামীণ এলিটদের শ্রেণি বিন্যাস

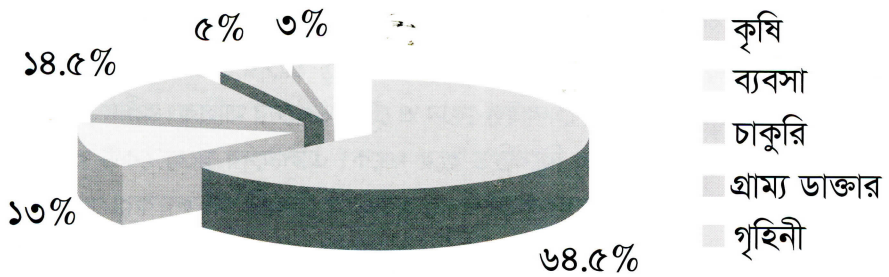

সূত্র: মাঠ জরিপ

পাই চিত্র (১.৫) উপস্থাপিত উপাত্তে দেখা যায় ১২৯ জন গ্রামীণ এলিট (৬৪.৫%) কৃষক এবং তাঁদের প্রধান পেশা কৃষি। গ্রামের অর্থনীতি মূলতঃ তাঁদের ওপরই নির্ভরশীল। উপরোক্ত উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। গ্রামের সমাজ নেতা এসব ভূ-স্বামীদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতে দেখা যায়। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। মোট ২৬ জন এলিটের (১৩%) প্রধান পেশা হলো ব্যবসা। ব্যবসায়ী এসব এলিট তুলনামূলকভাবে ধনী এবং তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণ জমিরও মালিক। জমিতে তাঁরা নিয়মিত চাষাবাদও করে থাকেন। মূলতঃ মুখ্য পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসাই তাঁদের মুখ্য পেশা বিবেচনা করা যায়। কারণ ব্যবসায় তাঁরা সরাসরি নিয়োজিত থাকেন। কৃষি শ্রমিকদের মাধ্যমে তাঁরা কৃষিকাজ পরিচালনা করে থাকেন। এ ধরনের পেশার লোকেরা তুলনামূলকভাবে ধনী এবং তাঁরা বেশির ভাগই স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকুরীজীবী শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চাকুরীজীবি এসব এলিট গ্রামবাসীদেরকে অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়ে থাকেন। মূলতঃ অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। এ শ্রেণির এলিটদের সংখ্যা ২৯ জন, যার গড় ১৪.৫ ভাগ। গবেষণা এলাকায় এলিটদের মধ্যে ১০ জন গ্রাম্য ডাক্তার রয়েছেন যার গড় ৫ ভাগ। গ্রাম্য ডাক্তাররা গ্রামবাসীদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি

হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। গ্রামবাসী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার সমাধানে এসব গ্রাম্য ডাক্তার এলিটের ওপর নির্ভর করে থাকেন। তাই গ্রাম সমাজে এদের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে দু'টি ইউনিয়নের ৬ জন মহিলা সদস্যের উপাত্ত গ্রহণ করা হয়। উপাত্তে দেখা যায়, তাঁদের সবাই গৃহিনী এবং তারা তাঁদের স্বামীর প্রভাবের কারণে নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। এসব মহিলা এলিট গ্রামের উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে কদাচিৎ জ্ঞাত হবার সুযোগ পান।

গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের পর গবেষণা এলাকার এসব এলিটের কোন কোন বিষয় এলিট মর্যাদা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তা সারণি- ১.১ এ দেখানো হয়েছে। সারণি-১.১ এ লক্ষ্য করা যায় ৭৭ জন (৩৮.৫%) গ্রামীণ এলিট সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য অর্থাৎ এলিট মর্যাদার জন্য 'সমাজসেবা'কে মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সারণি-১.১-এলিট মর্যাদার সহায়ক উপাদন চিহ্নিতকরণে গ্রামীণ এলিট

উপাদান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সমাজ সেবা	৭৭	৩৮.৫%
শিক্ষা এবং সমাজ সেবা	৩৪	১৭%
শিক্ষা, সমাজসেবা এবং পারিবারিক মর্যাদা	৩৬	১৮%
পারিবারিক মর্যাদা	৯	৪.৫%
রাজনৈতিক সমন্ধীকরণ	৭	৩.৫%
শিক্ষা, সমাজসেবা এবং বংশ মর্যাদা	৩৭	১৮.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

শিক্ষা এবং সামাজসেবাকে গ্রামীণ এলিট মর্যাদার জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন ৩৪ জন গ্রামীণ এলিট (১৭%)। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যদিকে নির্বাচিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ৩৬ জন (১৮%) এলিটের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক কাজ ও বংশ মর্যাদাকে তাঁদের বর্তমান সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য চিহ্নিত করেছেন। এ শ্রেণির এলিটেরা উচ্চ বংশের সদস্য এবং তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা ও সামাজিক কাজের পাশাপাশি তাঁরা বংশ

মর্যাদাকে এলিট মর্যাদার জন্য সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, বংশ মর্যাদার সাথে শিক্ষা ও সমাজসেবার সমন্বয় গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্বে দ্রুত প্রবেশন ঘটায়। আবার উত্তরদাতা এলিটদের মধ্যে মোট ৯ জন গ্রামীণ এলিট (৪.৫%) শুধুমাত্র পারিবারিক মর্যাদা বা বংশ মর্যাদাকে তাঁদের সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এসব এলিট অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় এবং সমাজসেবামূলক কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই এমন মতামত পোষণ করেন বলে অনুমান করা যায়। যদিও প্রতিনিয়ত তাদেরকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। ২০০ জন এলিটের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৩.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের এলিট মর্যাদার জন্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে সহায়ক বিবেচনা করেছেন। এ সকল এলিট মোটামুটি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। গ্রাম পর্যায়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্যই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার পরিচয় প্রদান করতে পছন্দ করেন এ শ্রেণির এলিটেরা। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। তাঁরা গ্রামীণ অন্যান্য এলিটদের ওপর প্রভাব বিস্তারে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে ব্যবহার করে থাকেন। তবে নিরীক্ষিত মোট এলিটদের মধ্যে ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের সামাজিক অবস্থানের জন্য শিক্ষা, সমাজসেবা এবং বংশ মর্যাদার সাথে রাজনীতির সহ-সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ সকল এলিট গ্রাম পর্যায়ে অধিক শিক্ষিত এবং তাঁদের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কারণে উপরোক্ত মত পোষণ করেন। গ্রাম পর্যায়ে তাঁদের প্রভাব চর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা উপরোক্ত সকল উপাদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। এলিটীয় মর্যাদা প্রাপ্তিতে উল্লিখিত সকল উপাদানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এসব উপাদানের সাথে ভূমি মালিকানার যোগসূত্র এলিটীয় মর্যাদার জন্য অনিবার্য। ভূমি মালিকানা এবং অন্য যে কোনো সহায়ক উপাদানের সমন্বয়ই কেবল একজন ব্যক্তির এলিট মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

১. গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদার নিয়ামক শক্তি হিসেবে এখনো ভূমি মালিকানাই যে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান তা বর্তমান গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ গ্রামে শীর্ষ স্থানীয় ভূমি মালিক। এই ভূমি মালিকানা তাদের এলিটীয় মর্যাদার অন্যান্য উপাদানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও কার্যকর করে।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমি মালিকানার পরিমাণগত তারতম্য ঘটেছে ঠিকই কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যিক পরিবারের সদস্যরাই গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রযুক্তিবান্ধব অভ্যাস, শহরের সাথে যোগাযোগ, প্রশাসনিক জ্ঞান, রজনীতি সচেতনতা, কৌশলী নেতৃত্ব এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রবণতা গ্রামীণ

সমাজে তাদের মর্যাদাকে ধরে রেখেছে।

৩. গ্রামীণ এলিটেরা তাদের মর্যাদা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ভূমি মালিকানার পাশাপাশি আধুনিক নানা প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন এবং শহরমুখী যোগাযোগকে গুরুত্ব প্রদান করেন। যেকোনো নেতৃত্বের অবস্থানকে সুসংহত করতে আধুনিক হওয়ার বিকল্প নেই। আধুনিক হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়া এবং শহরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি করা । নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো করে থাকেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি তাঁদের এ চেষ্টাকে সফল করেছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে তারা দেশের গন্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও মনোযোগী হওয়ার চেষ্ট করছেন প্রতীয়মান হয়।

৪. ভূমি মালিকানা এবং অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়াও শিক্ষা সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা এলাকার এলিটেরা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন। শিক্ষা গ্রামীণ এলিটদের দুরদর্শিতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে অর্জিত গুণের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। ফলে গ্রামীণ সমাজে তাদের অবস্থান মজবুত হয়।

৫. গ্রামীণ এলিটদের বসত বাড়ির বিন্যাস ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মূলতঃ শহরের ন্যায় আধুনিক পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণের কারণে গ্রামীণ এলিটেরা প্রায়ঃশ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।

৬. গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে বিলাসী সামগ্রী (মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার

গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রামই হলো প্রাণ। গ্রামীণ সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, পেশাগত সাদৃশ্য এবং স্বকীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব এর জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ পারস্পরিক অবস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সূচকের তারতম্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস করার প্রবণতা নতুন নয়। ভূমিকা এবং প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্বে অবস্থান গ্রহণ সাম্প্রতিক প্রবণতা। গ্রামীণ সমাজে ভূমিকা এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের সনাতনী উপাদানের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহ্যিক উপাদানের সাথে ভূমিকার সমন্বয়ে গ্রামীণ সমাজে এলিটীয় মর্যাদা আরও বেশি অর্থবহ রূপ লাভ করেছে বলা যায়। গ্রমীণ অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ জরুরী। ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা আগের মতো না থাকলেও উন্নয়ন ভূমিকা পালনের ম্যাধমেই গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব অব্যাহত রেখেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা তাই চূড়ান্ত কিছু নয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এলিটদের বর্তমান অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভূমি মালিকানা এবং আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পেলেও এখনও তাঁরাই এলিট। এই এলিটীয় মর্যাদার জন্য তাঁরা তাদের বুদ্ধি, কৌশল, শিক্ষা এবং গোষ্ঠীগত ঐক্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। আবার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিংবা সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যারা গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন তাঁরাও গ্রামীণ এলিটদেরই বংশধর।

তথ্য নির্দেশিকা

১. করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), *সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

২. খান, এফ. আর., *সমাজ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব*, ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন, ১৯৮০।

৩. চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ্(মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ইমদাদুল হক অনুদিত), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩।

৪. প্রথম আলো, ঢাকা: ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৫. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, ২০১৯, www.Bangladesh.gov.bd.

৬. বার্টোসি, পিটার জে.,(বাংলায়) *অস্পষ্ট গ্রাম: পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন*, ঢাকা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৯২।

৭. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২।

৮. রহমান, এস.এম. জিল্লুর, *বাংলাদেশের গ্রামীণ জ্ঞাতিত্ব*, রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯।

৯. রূপা, ইসরাত জাহান, *বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা: নির্বাচিত গ্রাম সমূহের ওপর একটি সমীক্ষা (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০০৫।

1. Afsaruddin, Mohammad, *Rural Life in Bangladesh,* Dacca: Nawroze Kitabistan, 1964.
2. Amsden, Alice H., Dicapria, Alisa and Robinson,James (ed.), *The role of Elites in Economic Development*, London: Oxport University Press, 2012.
3. Bhat, K.S., *Emerging Pattern of Leadership in Panchayati Raj Set up in Mysore State,* Hyderabad: NICD, 1967.
4. Bonjen, C.M. and D.M. Olson, Community Leadership: Directions for Re-

search, *Administrative Science Quarterly,* Vol. IX. No. 3 December, 1964.

5. Bottomore, T.B., *Elites and Society,* London: C.A. Watts, 1964.
6. Dahl, Robert A., *Who Governs,* New Haren: Yale University Press, 1963.
7. Darshankar, Ay, *Leadership in Panchayati Raj,* Jaipur: Panchsheel Prakashan, 1979.
8. Dube, S.S., *Indian Village,* London: Routledge & Kegan Pal, 1951.
9. Dube, S.C., *Indian Changing Village: Human Factors in Community Development,* Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1967.
10. Endruweit, Gunter, *Elites as Egents of Economic Development in Verlag Waltrachiv,* Hamburg, Vol. 19. Iss 1, 1984.
11. Giddens, Anthony, *Elites in the British Class Structure,* in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press, 1973.
12. Hunter, Floyd, *Community Power Structure: A Study of Decision Makers,* Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.
13. Jahangir, B.K., *Differentiation Polarisation and confrontation in Rural Bangladesh,* Dacca: Centre for Social Studies, 1979.
14. Jahangir, B.K., *Rural Society, Power Structure and Class Practice,* Dhaka: Centre for Social Studies, 1982.
15. Jennings, M.K., *Community Influentials: The Elites of Atlanta,* London: The Free Press of Glencoe, 1964.
16. Karim, A.H.M. Zehadul, *Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh,* (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.
17. Karim, A.H.M. Zehadul, *Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages,* Dhaka: University Grants Commission, 1979.
18. Karim, A.H.M., Zehadul, *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society,* New Delhi: Northern Book Centre, 1990.
19. Kornhauser, William, *The Politics of Mass Society,* London: Routledge & Kegen Pal., 1965.
20. Lasswell, H.D. *et. al. The Comparative Study of Elites,* Standford: Hoover Institute, 1952.
21. Mills, C. Wright, *The Power Elite,* New York: McGraw Hill Book Company, 1956.

22. Mills, C., Wright, *The Marxists,* New York: Dell Publishing Co., Inc. 1968.
23. Mukhurjee, R.K., *Six Villages of Bengal,* Bombay: Popular Prokashan, 1971.
24. Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society,* New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.
25. *Population Census-2001,* Bangladesh Bureau of Statistics, Planning division ministry of planning government of Bangladesh.
26. Rangnath, *The Changing Pattern of Rural Leadership in Uttar Pradesh,* New Delhi: Indian Academy of Social Science, 1971.
27. Rumi, Syed Nasar Ahmed, *Rural Elites and their Role in Development: A case Study in Kustia District* (Unpublished M.Phil. thesis), Rajshahi University: IBS, 1985.
28. Satish, Arora, *India's Rural Politicians: Two Faces of Power.,* Economic and Political Weekly. Vol-VII, February 1972.
29. Schulze, R.O. and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites, *The American Journal of Sociology,* 13 (3), 1959.
30. Sebudubudu, David & Molutsi, Patrick, *The Elite as a Critical Factor in National Development-The Case of Botswana*, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2011.
31. Sharma, S.S., *Rural Elites in India,* Delhi: Sterling Publisher, 1979.
32. Sing, Harjinder, *Authority and Influence in two Sikh Villages,* 1976
33. Singer, Marshall, *The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon,* Cambridge: The Press, 1964.
34. Sirsikar, V.M., *The Rural Elite in a Developing Society,* Bombay: Orient Longmans, 1970.
35. Wahab, Muhammad, *The Rural Political Elite in Bangladesh: A Study of Leadership Pattern in Six Union Parishads of Rangpur District* (Unpublished M.Phil. Dissertation), Rajshahi University: IBS, 1980.

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম[১] এবং তানযিনা আক্তার[২]

Abstract

Education is regarded as foundation of the development of a society and is meticulously treated as the backbone of a nation. The importance is thus easily understandable how education contributes to the progressive development of a country in all socio-economic aspects. Education helps develop intrinsic qualities, enhances skills, expedites economic growth, harmonizes mental development, and inculcates established values and norms of the society. It also creates a learning society to establish it as the helm of practicing and establishing a venality-free country. Father of the nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman struggled throughout his life to establish a peaceful country to find the beatific smile of general people. The necessity of education for building and developing a new state is undeniable which he learnt from the educational institutes and socio-cultural environment he had gone through. Thus, he put education at the forefront of the issues on which he placed more importance in the reconstruction of Bangladesh. This article sheds light on Bangabandhu's philosophy of education and development thinking, how he nurtured the underlying purpose of education, what steps he took to transform the education system of Bangladesh into a modern one, and above all how he wanted to institute education as a liberator of human liberation. To enrich this theoretical discussion, Bangabandhu's speeches, periodicals, books, and researches on Bangabandhu have been used, meaning that the article is based on secondary sources of data.

Keywords: Bangabandhu, Education, Language, Socio-Economic Development, Notional Policies

ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজ উন্নয়ন, দেশ ও জাতিগঠন ও উন্নয়ন সাধন সর্বোপরি মানুষের

১ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। ই-মেইল: rezapatc@gmail.com

২ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার , ঢাকা। ই-মেইল: tanzina.bpatc@gmail.com

আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি কখনই উন্নয়ন সাধন করতে পারে না বলেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে তুলনা করা হয়। শিক্ষা তাই নিজস্বভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে সমাজকে আলোকিত করার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। আবার নেলসন ম্যান্ডেলা একে বিশ্বকে পরিবর্তন করার শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাঙালি কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের বলয়ের বাইরে পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর সাথে সংগতি রেখে ব্যক্তি জীবনের সাদৃশ্যপূর্ণ অভিযোজন হিসেবে বর্ণনা করেছেন (করিম ও নন্দি, ২০১৩)। মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মন ও মননের উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ। বিশ্বমনীষী, দার্শনিক, সমাজচিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রত্যেকেই শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে যেমন তাত্ত্বিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চিন্তাবিদদের নিয়ে, তাঁদের সুপরামর্শে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিনায়কগণ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন (কুদরত-ই-খুদা ও অন্যান্য, ১৯৭৪; হোসেন ও অন্যান্য, ২০২১)। একটি নতুন রাষ্ট্র বির্নিমাণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এই সুগভীর সত্যটি অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুনঃগঠনে যেসব বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষা তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে। আর তাই শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত করা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, উন্নততর রাষ্ট্র এবং সবার জন্য বসবাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী । বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনায়, মননে ও মস্তিষ্কে, কথা ও কাজে সেই সুন্দর পৃথিবীর কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হতো। তিনি এমন এক শিক্ষা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে একটি সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে; প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ (রহমান, ২০২০; আহমেদ, ২০২১)।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে তার ব্যক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে আন্দোলন, পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর কাছে শিক্ষা শুধু অধিকার হিসেবে নয় বরং মানুষের মুক্তির কার্যকরী অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলের বাইরে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Dhaka University Talk, 2020; ঠাকুর ২০১৬)।

এ প্রবন্ধটিতে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে কীভাবে তাঁর মানসপটে শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লালিত হয়েছে, তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরকরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং সর্বোপরি মানবমুক্তির বৈতরণী হিসেবে কীভাবে শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই ও গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবন্ধটি মূলত পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত ।

বঙ্গবন্ধুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ এবং সমাজ দর্শন

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দর্শন ও শিক্ষা আবর্তিত হয় তাঁর স্কুল-কলেজে গৃহীত শিক্ষার মধ্য দিয়ে যা তিনি ধারণ করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দর্শন অর্জিত ও সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা আবর্তিত হয় অন্যের জন্য কাজ করা, সমাজের বৈষম্য কমানো, দাঙ্গারোধে ভূমিকা রাখা, অধিকার আদায়, শিক্ষায় বিনিয়োগ, পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ নিয়োগ করার মত বিষয়গুলোতে। এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তার বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায়।

দেশ গঠনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে এবং সমাজের বৈষম্য কমাতে সংবিধানের বড় একটি ভূমিকা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অধিকার হিসেবে আদায়ের জন্য একটি ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে। সংবিধানে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার উল্লেখ রয়েছে, যেমনঃ ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে;

১। "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পযর্ন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান।"

২।"সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ উদ্দেশ্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত নাগরিক সৃষ্টি।"

৩।"আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।"

অর্থাৎ, সাংবিধানিকভাবেই সকলকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হবে। দেশকে পুরোপুরি নিরক্ষরমুক্ত করতে শুধু শিক্ষাটা দিলেই হবে না, সমাজ-রাষ্ট্র কীভাবে চাচ্ছে এবং কীভাবে সেটা ব্যবহার করা হবে সে ব্যবস্থাও নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে যাঁরা শিক্ষা প্রদান করবেন তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। মানুষ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগবে সেরকম প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারার অধিকার একটি পূর্বশর্ত রূপে কাজ করবে। বাস্তবিকরূপে, রাষ্ট্রের কাছে একজন নাগরিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রত্যাশা করতে পারবে। অন্য কথায়, ছাত্র-শিক্ষক বা দেশের কোন নাগরিক সঠিক শিক্ষার দাবি তুলতে পারে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্বাধীনচেতা মানুষ নিজেকে গড়ে তুলতে লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিফলন পাওয়া যায় বিভিন্ন কর্মকান্ডে। সেই সাথে তাঁর মাঝে রাজনৈতিক চেতনা ও জাগ্রত ছিল। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান যখন তৈরী হয় তখন তিনি বলেন,

"আমি ভাবতাম পাকিস্তান হয়েছে, চিন্তা কী ? এখন ঢাকা যেয়ে ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছু দিন মন দিয়ে লেখা পড়া করা যাবে। চেষ্টা করবো, সমস্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়" (রহমান, ২০১২, পৃঃ ৫৬)।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা তাঁর সমগ্র জীবনে পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক তৎপরতার কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তেমনিভাবে, খাদ্যসমস্যা, শিক্ষাসংকট, ভাষা আদায়সহ সকল আন্দোলন তরান্বিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে জেলখানায় বন্দী থেকেও তিনি কথা বলে গেছেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাংলা ভাষার অধিকার অর্জনের জন্য। তিনি যখন নাজিমুদ্দিন রোডের জেলখানায় ছিলেন তখন পাশের বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" বা "বন্দীদের মুক্তি চাই" বলে ভাষার দাবিতে আন্দোলন করছিলেন যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি অন্যদের সাথে আলোচনা করেছিলেন যে, আমাদের বোনেরা সোচ্চার হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমরা অবশ্যই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে আদায় করতে পারবো। এর থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি সমাজ বিনির্মানে মেয়েদের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন (রহমান, ২০১৮)।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারিদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ছাত্রাবস্থায় বহিস্কৃত হওয়া। এরপর তিনি আর ছাত্র হিসেবে আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। এ থেকে তাঁর একটি আদর্শ, নিজের থেকে অন্যদের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়েও শিক্ষার উপর তাঁর গুরুত্বারোপ অনুধাবন করা যায় কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিরা শিক্ষা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কর্মচারিদের নায্য অধিকার আদায় হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো থাকবে আর শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। দেশের মানুষ সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। পরবর্তিতে দেখা গেছে তিনি ছাত্রদের সাথে আন্দোলন করেছেন, একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ছাত্রদের '৫৪, '৬৩ বা '৬৯ সালের কাজের সাথে তিনি ছিলেন। কখনো কখনো কারাগারে থেকেও তিনি সমর্থন করে গেছেন। দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর

সমগ্র জীবনের বিভিন্ন আন্দোলনে শিক্ষার সম্পৃক্ততা ছিল।

শিক্ষা সমাজ তথা জাতি গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হবে তা তিনি চিন্তা করেছেন। শিক্ষাকে তিনি জাতি গঠনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারেনা। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। দারিদ্র যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে সৃষ্টি রাখতে হবে"। (মোমেন, ২০২০)

শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার যা বর্তমানেও অনেক কম (১.২৯%)। তার মানে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বা বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট খাত হিসেবে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু, শিক্ষকদের বেতন না বাড়ালে জাতিকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ঝুঁকির মুখে পড়বে। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কথা বিশেষভাবে বলেছেন কেননা প্রাথমিক শিক্ষাই একজন ছাত্রের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এর সাথে নজরে আনার মত আরেকটি বিষয় হল দারিদ্র। ২০১৯ সালে দেশে প্রায় ২০.৫ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে (বিবিএস, ২০১৯) এবং প্রায় ১০.৫ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে (বিবিএস, ২০১৯)। বঙ্গবন্ধু ভেবেছেন দারিদ্র যেন মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় না হয়। তাই, শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটু অন্যভাবে সাজাতে হবে; বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছাত্রদের জন্য পুষ্টি ও শিক্ষা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা হল বিনিয়োগ, যেমন; সন্তানদের নতুন বই কিনে দিলে তারা সেটা পড়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করতে পারবে। এ বিষয়গুলো তাদের মধ্যে পড়াশুনার আগ্রহ তৈরি করবে। এ বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ, মানবিকতাবোধ, পেশাদারিত্ব ও বিশ্বকে দেখার নতুন জ্ঞান আহরণ করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ তৈরি হয়। শিক্ষার একটি দিক হিসেবে প্রশিক্ষণও মানুষের মাঝে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করে, যেমনঃ কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা একজন মানুষকে অন্য ব্যক্তিদের থেকে বেশি পারদর্শী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিশু-কিশোররা অনেক বিষয় নিজেরা শিখতেও পারছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যা তাকে জীবনকে সুন্দরভাবে দেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। এবিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুর শিশুকাল থেকে তাঁর বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যার প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষ হওয়ার দীক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নকল করে পাস করার বিষয়ের বিরোধিতা করে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন,

"আমার ছাত্র ভাইয়েরা, লেখাপড়া করুন। আমি দেখে খুশি হয়েছি, আপনারা নকল টকল বন্ধ করেছেন"। আবার, তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলেন, "আপনারা লেখাপড়া শেখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন" (মোমেন, ২০২০, পৃঃ ৫৫৭)।

তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ববোধ তৈরি করা তা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় মাতৃভাষা

একটি জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। সেই সাথে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশী ভাষা চর্চাও আবশ্যক। বঙ্গবন্ধু এদেশের শিক্ষার বিকাশের জন্য একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন যার মূল বিষয়গুলো ছিল; মাতৃভাষায় শিক্ষা, সর্বত্র বাংলা চর্চা, নববর্ষ পালন, বিদেশে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার, ভাষা আন্দোলন, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা একাডেমি, অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু যতবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মাধ্যম দেখা। তিনি চীন ভ্রমণকালে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করতে চাইতেন কেননা পৃথিবীর খুব কম ভাষার জন্যই মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'আমার দেখা নয়া চীন' বইয়ে চীনের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কথোপকথন ব্যাখ্যা করেছেন। তারা দোভাষীর মাধ্যমে আলাপচারিতা করছিলেন। দোভাষী যখন ২/১ জায়গায় ভালোভাবে ইংরেজি বলতে পারছিলেন না তখন সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর নিজেই তাকে ইংরেজি করে দিচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ভদ্রলোক ভালো ইংরেজী জেনে ও ইংরেজী বলেন না । জাতীয় ভাষায় কথা বলেন, আমরা বাঙ্গালি হয়ে ও ইংরেজী আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই। বলতে না পারলে এদিক ও দিক করে বলি" (পৃঃ ৬৮)।

এখান থেকে দেখা যায় চীনের ভাইস চ্যান্সেলর ভালো ইংরেজি জানার পরও মাতৃভাষায় কথা বলছিলেন। আর বাঙ্গালীরা মনে করেন অধিক শিক্ষিত মানুষ ইংরেজিতে কথা বলেন। এই দুর্বলতাটা বঙ্গবন্ধু তখনই দেখতে পেয়েছিলেন। এখনো অনেক শিশুদের দেখা যায়

স্যাটেলাইটের বদৌলতে হিন্দি ভাষা ভালো বলতে পারে। তাদেরকে মাতৃভাষার মর্ম বোঝাতে হবে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিকে, ১৯৭২ সালের ১৭মে তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, গবেষণা, বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রকৌশল ও বৃত্তিমূলক বইয়ের বাংলা, অনুবাদ এবং মৌলিক পুস্তক রচনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেকনোলজিক্যাল বিষয়ও নিজস্ব ভাষায় প্রদান করা হয়, যেমনঃ থাইল্যান্ডে নিজস্ব ভাষায় ফেসবুক বা ইউটিউব ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে বই পাওয়া যায়। নিজের ভাষার মাধ্যমে জানতে হবে বিশ্ব কীভাবে এগোচ্ছে বা পরিবর্তিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুও সেখানে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন।

'আমার দেখা নয়া চীন' বইয়ে বঙ্গবন্ধু চীনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে সেখানে আর (কেরানি পয়দা) করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলেন। সেখানকার এক প্রফেসর, মি. হালিম, বলেছিলেন,

"বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে" (পৃঃ ৬০)।

এখান থেকে বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হবে মানুষ গড়ার কারখানা। কারিগরি শিক্ষার উপর আজকাল গুরুত্বারোপ করা হলেও বঙ্গবন্ধু তা পঞ্চাশের দশকে, একাত্তরের নির্বাচনের পূর্বে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বলে গিয়েছিলেন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে নব্বইয়ের দশকে। তিনি আরও লিখেছেন,

"আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস' অন্য দেশে শিল্পপতিরা, 'প্রিভিলেজড ক্লাস' কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই (প্রিভিলেজড ক্লাস) (পৃঃ ৬০)।

চীন শিশুদেরকে যেভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল তা দিয়ে চীন আজ উন্নত একটি দেশ। কারণ, আজকের শিশুরা বড় হয়েই আগামী দিনের সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে এবং অন্যদের নেতৃত্ব দিবে, তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই, তাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে, তাদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, চীন শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি জ্ঞানের গুরত্ব দিচ্ছে। ১৯৫০-এর দশকে বঙ্গবন্ধুর সেই উপলব্ধির সুফল দেখতে পাই যখন আশির দশকে চীনের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশ থেকে কম ছিল কিন্তু বর্তমানে তা অনেক বেশি। আশির বা নব্বইয়ের দশকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বাংলাদেশ তাইওয়ান বা কোরিয়া থেকে আসতো, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাজারে

প্রায় সবকিছুই চীনে উৎপাদিত পণ্য। তাই, বাংলাদেশকেও শিশুদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই তারা পরবর্তীতে পিতা-মাতা, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ সর্বদাই দৃশ্যমান। চীনে গিয়েও তিনি সহযাত্রীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণে যান। বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রফেসর এবং কিছু ছাত্র তাকে বরণ করে নিয়েছিল, খাবারের আয়োজন করেছিল। হল রুমে ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা, প্রফেসর সংখ্যা, নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলতে ভবন নির্মাণে সরকারের সহয়তা ইত্যাদি তথ্য প্রদান করেন। "আমার দেখা নয়া চীন" বইয়ে তিনি লেখেন,

"আমরা ক্লাসরুম দেখলাম, বিজ্ঞান শাখা দেখলাম, বিদেশী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দেখলাম" (পৃঃ ৬৭)।

এখানে বঙ্গবন্ধু আলাদা করে বিজ্ঞান শাখার উপর জোরারোপ করেছেন, কেননা বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া দেশ এগুবে না। আবার, শিক্ষাকে নিজের দেশে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্য দেশ থেকেও আহরণ করতে হবে, যেমনঃ ষাটের দশকে কোরিয়ান একটি দল এসেছিলেন বাংলাদেশের আদমজী জুট মিল-এর ব্যবস্থাপনা দেখতে। তখন তাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশ থেকে কম ছিল। কিন্তু, আজ সে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ, বর্তমানে তাদের প্রস্তুতকৃত স্যামসাং মোবাইলে বাংলাদেশের বাজার সয়লাভ যা প্রমাণ করে বাংলাদেশ তাদের মত উন্নতি করতে পারেনি। অন্যান্য দেশ থেকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হবে। পাটের জিনোম আবিস্কার করা বাঙ্গালী বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমকে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী আমেরিকা থেকে অনুরোধ করে নিয়ে এসেছিলেন নিজভূমে কাজ করার জন্য। ধারণা করা হয় শুধু বিনিয়োগের অভাবে গবেষণাচর্চা বেশি দূর এগোয়নি। এমনিভাবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঙালি যারা কাজ করছেন তাদের জ্ঞান আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাতে পারি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে আমাদের দেশের মেধাবী ব্যাক্তিরা কাজ করে সেদেশকে সমৃদ্ধ করছে।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৫৬ সালে করাচীতে দেয়া ভাষণে তিনি অন্যান্য ভাষার (উর্দু, সিন্ধ, পাঞ্জাবী) সাথে বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। পকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষদের এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করেছেন তিনি কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন একটি দেশের উন্নয়নে শিক্ষা দরকার যা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি জানতে হবে যা এখন একটি প্রযুক্তি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদ তাঁর কথা-কাজে প্রকাশিত হতে দেখতে পাওয়া যায়,

"বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু না কিছু জানে। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি" (রহমান ২০২০, পৃঃ ৪৩)।

বর্তমানে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহীত হওয়ার পেছনে তাঁর অবদানও কম নয়। তিনি জানতেন বাংলায় ভাষণের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে তিনি বাংলাকে পরিচিত করতে পারবেন। তিনি এতটাই ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন যে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিনি বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে বাংলাকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরী হয়। এর মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলা ভাষার আজকের আন্তর্জাতিকীকরণের সুপ্ত পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করতেন। যা আমরা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে উল্লেখ পাই। তিনি নিজেকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর জীবনে বাঙালি সংস্কৃতি ও নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। পাকিস্তান সরকার আমলে, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৭, পহেলা বৈশাখে জেলখানার রাজবন্দীরা কয়েকটা গোলাপ ফুল দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। বঙ্গবন্ধু তেমনি বিভিন্ন সেলে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে বাঙ্গালির এই সংস্কৃতি উৎযাপন করেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী তাকে কবিতা (আজিকে নতুন প্রভাতে নতুন বর্ষের আগমনে---মুজিব ভাইকে) লিখে পাঠিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা কতটা গুরুত্ব সহকারে তিনি পালন করতেন।

বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধির সাথে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হওয়ার মতো কোন ক্রমেই স্কুল মাষ্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেনশনভোগী জরা জীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে। ইংরেজ ছেলেদের শিক্ষার প্রণালী এরূপ নহে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ তাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে তাহা নহে, তারা আলোক-আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয়না"(ঠাকুর, ২০১৬)।

শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার বা জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, সমাজের মানুষের জন্য কাজ করবার জন্য প্রয়োজন। শিক্ষা মানে শুধু পড়াশুনা করাই নয়, বরং জ্ঞান বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও শরীরচর্চার মাধ্যমে সুস্থদেহ গঠন করাকেও বোঝায় (রহমান, ২০২০)। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু যখনই রাজনৈতিক কোন বিষয়ে আলোচনা বা দাবি উত্থাপনের সুযোগ

পেয়েছেন তখনই নারীদের শিক্ষার উপর জোড় দিয়েছেন কেননা একজন শিক্ষিত নারীই একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টোতে নারী-পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বৃত্তি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাসহ শিক্ষা নীতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ছিল। মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে কেননা তাঁর উপলব্ধি গভীর হয়। অন্য ভাষায় শিক্ষা বাংলায় অনুবাদ করে বুঝতে গেলে তা সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় এবং তা মাতৃভাষার মত হৃদয় স্পর্শ করে না।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফার দুটিতে শিক্ষার উল্লেখ ছিল। সেখানে বঙ্গবন্ধু পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতাসহ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন। আমূল সংস্কার বলতে তিনি সময়ের সাথে যুগোপযোগী শিক্ষার কথা বলেছেন যা গ্রহণ করে মানুষ তাঁর জীবিকা অর্জনের পথ নিশ্চিত করতে পারে, যেমনঃ বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার পথ সুগম করা যায়। গণপরিষদের সদস্য হিসেবেও ভাষণ দেয়ার সময়ও তিনি বারবার শিক্ষার মান কিভাবে বাড়াতে হবে, অবৈতনিক করতে হবে, কোন স্তর (নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর) পর্যন্ত করতে হবে, মাতৃভাষায় শিক্ষা (শুধুমাত্র বাংলা নয়) প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছেন।

রাষ্ট্রীয় নীতি-কাঠামোতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ

বঙ্গবন্ধু সব সময় শিক্ষাকে রাজনীতির একটা অংশ হিসেবে এনেছেন কেননা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অর্জন রাজনৈতিক বা ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তাই তিনি শিক্ষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তদপরি, দেশ-বিদেশ যেকোন স্থানেই যেকোন আন্দোলন সফল করার জন্য ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তিনি রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পাশাপাশি ছাত্রসমাজ তথা শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকও বিবেচনা করেছেন। তাই তিনি ৩০ জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে উত্তরবঙ্গ সফরকালে এক ভাষণে বলেছেন,

"আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করা হচ্ছেনা।শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেনা। যখনই জনগণ ন্যায্য অধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ করে তখনই মুসলিমলীগ সরকারের পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়"(মোমেন, ২০২০)।

এর থেকে ছাত্ররা ভাবে বঙ্গবন্ধু তাদের প্রাণের দাবি উত্থাপন করেছেন সুতরাং তাঁর সাথে কাজ করতে হবে। অবহেলিত শিক্ষক সমাজও তাঁর সাথে আন্দোলনে যোগ দিবেন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখাবে। সরকার থেকে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তা সঠিকভাবে

অনুধাবন করতে শিক্ষা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

এই রিপোর্টটি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে বেশি পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর পড়াশুনা, শিক্ষা গ্রহণ এবং বিদেশ ভ্রমণের প্রতিফলন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি মানবিক দিক, ধর্ম নিরপেক্ষতা, চরিত্র গঠন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা-গবেষণা, নারীর অংশগ্রহণ এবং উচ্চ-শিক্ষার কথা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (ড. কুদরত-ই-খুদা ও অন্যান্য, ১৯৭৪)। এই কমিশনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো:

* স্বাধীনতার পরপরই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর জাতীকরণ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের বেতন সমস্যার সমাধান

* কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো

* নারী শিক্ষায় অগ্রধিকার প্রদান

* প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

* বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন

* বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

* জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

* শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, ক্রীড়া ও শরীরচর্চার উৎসাহিতকরণ

* বিশ্ব নাগরিকত্ব

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরত্ব দিয়েছেন এবং কমিশন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার যে বিষয়টি রিপোর্টে ছিল তা বর্তমান সরকার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার, যা বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, তথা বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার এখন বৃত্তি প্রদান করছে। ডিজিটাল সেবা সহজলভ্য হওয়ার কারণে অনেকে সহজে কর্মমূখী ও বৃত্তিমূলক

শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। চাকরির জন্য অপেক্ষা না করে নিজে উদ্যোক্তা হতে পারছে। রিপোর্টে কৃষি শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাবনাগুলো যদি আমরা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারতাম তবে দেশে বেকারত্বের হার কমে যেত। আবার, একটি গবেষণায় দেখা গেছে উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার আরও বেশি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন করলে এত বেশি উচ্চ শিক্ষিত বেকার তৈরি হত না। আবার, কর্মসংস্থান ও বৃদ্ধি পেত।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতম শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষকদের অনেক সম্মান করতেন, যেমনঃ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়েও তাঁর কোন শিক্ষক তাঁর কার্যালয়ে গেলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন।

শিক্ষা প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রদান এমন একটি পবিত্র দায়িত্ব যা প্রতিপালনের মাধ্যমে একটি জাতি বিকশিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এমন এক দক্ষ জনগোষ্ঠী দরকার যারা প্রতিনিয়ত শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, কাজ করেন। তাই বঙ্গবন্ধু প্রফেসর কবীর চোধুরীকে শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৬)। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করে প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রফেসর আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। এই তিনজন শিক্ষক সমসাময়িক সময়ে জ্ঞানের দিক দিয়ে অন্যতম ও সবার সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁদের দায়িত্বে শিক্ষা ব্যবস্থার এক উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল।

শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ দরদ ছিল বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা কমিশন গঠন থেকেই বোঝা যায়। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দুইজন প্রফেসরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কমিশনে প্রফেসর নুরুল ইসলামকে ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর রেহমান সোবহানকে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শিক্ষকদের দেশ ভাবনা মেধা, নীতি, মর্যাদা, আদর্শ, সমাজ গঠনে ভূমিকা, এই বিষয়গুলো দেশ উন্নয়নের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। সেখানে উন্নয়ন পরিকল্পনার উৎকর্ষতা সাধনে গবেষণা কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠন এবং মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো; শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাই পুঁজিবাদী সমাজের মত শিক্ষা শুধু ধনীদের হাতের নাগালের বাইরে সবার জন্য আবশ্যকীয় করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য কমানো। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্রতা যেন উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য তিনি মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির কথা বলে গেছেন। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণ, কর্মমূখী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ করা যায় যে, মাদ্রাসাগুলোতে তুলনামূলক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে থাকে এবং এদের চাকরির সুযোগও কম। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি পাঠিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ প্রদানকালে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও সম্বোধন করে কথা বলতেন। কেননা, মেয়েদের পিছনে ফেলে একটি দেশের সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ধারনা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হেরে যাওয়ার একটি কারণ হল শুধু পুরুষ সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধ করা। বঙ্গবন্ধু চমৎকারভাবে লিখেছেন,

"সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ না করে তাহলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোন দিন বড় হতে পারেনা" (রহমান, ২০২০)।

অর্থাৎ, নারীদের ঘরের বাইরে এসে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। চীন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে সেই পঞ্চাশের দশকেই বঙ্গবন্ধু নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখে গেছে। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় সবসময় যে শিক্ষার উন্নয়ন ছিল তা বুঝতে পারা যায় ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে দৌলতপুর, খুলনার ছাত্র সভায় দেয়া ভাষণে তিনি বলেন,

"শিক্ষাদীক্ষা হইল মানব সভ্যতার মাপকাঠি-অথচ আমাদের অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া কোন মুখে আমরা বিশ্বের দরবারে নিজ দিগকে সভ্য জাতি বলিয়া গৌরব করিব? আজ দেখিতে পাইতেছেন আমাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হইতে

বসিয়াছে, শিক্ষকদের বেতন না বাড়াইলে শিক্ষার সমস্যার সমাধান অসম্ভব"(এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০)।

এখানে তিনি সভ্য জাতি গঠনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে বলেছেন। একটি দেশের উন্নয়ন বা একটি দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, সমাজ গঠনে শিক্ষকদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তাঁর বলে যাওয়া কথা আজও আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে জানান দেয়, শিক্ষা দ্বারাই একটি জাতির অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সভ্য তার আগমন হয়।

তিনি ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি মুক্তি সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে বলেন। তিনি বলেছিলেন,

"আমাদের একটি পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশনাসহ একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি" (মোমেন, ২০২০, পৃঃ৩০৪)।

শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে দেশ প্রেমিক হিসেবে প্রস্তুত করা যার কথা তিনি বলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন ভাষণে শিক্ষার পাশাপাশি জনপ্রশাসনের প্রশিক্ষণের কথাও বলে গেছেন। যার মাধ্যমে একজন দক্ষকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। যেমনঃএকজন কম্পিউটারে টাইপের কাজ করতে করতে অনেক দক্ষ হতে পারে। ২০ জুলাই ১৯৭৫ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসুচির উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন,

"আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর সবচেয়ে বেশি শেখে যে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন"(মোমেন, ২০২০)।

এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হাতে কলমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে করে নিজে করে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং ভালো সেবা দিতে পারে। যে সেবা এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য; এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী দরকার । যার ফলে তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবা-মার কাজে সহযোগিতা করার কথা বলে গেছেন। স্কুল বন্ধের সময় যাতে তারা বাবা-মার সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতে পারে সে কথাও তিনি বলে গেছেন। এর মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার সাথে সরাসরি কর্মের সংযোগ থাকবে।

উপসংহার

মানবিকতার মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও দেশগঠনের শিক্ষা গ্রহণ করাই প্রকৃত শিক্ষা। সন্তানদেরও সেই শিক্ষা দিতে হবে যাতে মমত্ববোধ ও অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতার পরশ পাওয়া যায় তাঁর এই বক্তব্য থেকে,

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি।একজন বাঙ্গালি হিসাবে যা কিছু বাঙ্গলিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পত্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে"(মোমেন, ২০২০)।

বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনই শিক্ষার আসল দর্শন। মানুষের প্রতি এই ভালবাসার কারণেই তিনি বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছিলেন এবং মানুষের শ্রদ্ধা ভাজন হয়েছিলেন। যে মানুষগুলোর জীবনের বিনিময়ে আমরা দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি তাদের বিসর্জনের কথাও বঙ্গবন্ধু সব সময় বলেছেন। ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ আত্মত্যাগকারী নারীদের বিসর্জনের কথা স্মরণ করে সকলকে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে এবং সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই শিক্ষাই আসল শিক্ষা যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক। মূলত আসল শিক্ষা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার শিক্ষা; দুর্নীতিমুক্ত দেশ, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান গড়ার শিক্ষা (করিম, ২০১৫)। শুধু আত্মোন্নয়ন নয়, অন্যের কল্যাণে কাজ করা, সম্পদের পাহাড় না গড়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। দেশের অর্থ বিদেশে পাচার না করে দেশের উন্নয়নে কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত হয়ে শব্দের বেড়াজালে আবদ্ধ করে এমন ক্যামোফ্লেজ তৈরি না করি, যা শিক্ষিত সমাজ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষকে হতভম্ব করে দেয়, যাতে সত্য আড়ালে পড়ে; অন্যায়ের সুযোগ অবারিত হয়। শিক্ষিত সমাজের অন্যায়ের ব্যাপারে, দায়িত্ব সচেতনতার বারবার উচ্চারিত বঙ্গবন্ধুর সেই শব্দমালা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে জনসাধারণ নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সচেতনতা বলতে মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে সবাইকে ভালো না রেখে নিজে ভালো থাকতে চাইলে কখনও সত্যিকার অর্থে ভালো থাকা যায়না; সেটা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোকনা কেন মনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মানুষ অনিরাপত্তায় ভোগে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি, সময়ের পরিক্রমায় একসময় আমরা থাকবনা, প্রতিষ্ঠান থাকবে, দেশ থাকবে। সেই দেশ, সমাজের জন্য কিছু করার শিক্ষাই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা।

তথ্য নির্দেশিকা

রহমান আতিউর (২০২০), বঙ্গবন্ধু বাঙালি বাংলাদেশঃ নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, প্যাঞ্জেরী পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০১৬), বিপুলা পৃথিবী, প্রথমা, ঢাকা।

ডক্টর মুহাম্মদ কুদরত-ই খুদা, ডক্টর সুরত আলী খান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, এম ইউ আহমেদ, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, মোহাম্মদ নুরুস সাফা, এম এ সাত্তার, আব্দুর রাজ্জাক, ফজলে হালিম চৌধুরী, আবদুল হক, আনিসুজ্জামান, স্বদেশ রঞ্জন বসু, নুরুল ইসলাম, এম শামসুল ইসলাম, আ কম জহুরুল হক, সিরাজুল হক, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, আবু সুফিয়ান, মাযহারুল ইসলাম, এ এম, হক শরফুদ্দিন, নূরুল মুহম্মদ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, হেনা দাস, আশরাফ উদ্দিন খান (১৯৭৪), বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মোমেন এ কে আব্দুল (২০২০), ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (২০১৬), শিক্ষা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০১৮), কারাগোরের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০২০), আমার দেখা নয়া চীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হোসেন মোঃ রকিব, শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক, মোহাম্মদ আবুল কাসেম মজুমদার, এম আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং আফিয়া রহমান (২০২১), ইডুকেশনাল ফিলোসফি এন্ড থটস অব বঙ্গবন্ধু: এন এনালাইসিস অব বাংলাদেশ ইডুকেশন কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

আহমেদ মঞ্জুর (২০২১), Building on Bangabanhu's Education Vision, The Daily Star, 12 March, Available at: https://www.thedailystar.net/opinion/news/building-bangabandhus-education-vision-2058941

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), (2019), Bangladesh Statistics 2019,

Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Dhaka University Talk (2020), বঙ্গবন্ধুর উচ্চ শিক্ষা ভাবনা, ডঃ আতিউর রহমান, ইউটিউব ভিডিও [১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০], প্রাপ্যতা: https://www.youtube.com/watch?v=HDpiY7Hj6Z0

করিম মোহাম্মদ রেজাউল (২০১৫), Public Education Spending and Income Inequality in Bangladesh, International Journal of Social Science and Humanities, vol. 5, no. pp. 75-79

করিম মোহাম্মদ রেজাউল ও নন্দি কল্যানী (২০১৩), 'The Comparative Study of Distributional effects of Public Expenditure on Education in Bangladesh and Thailand', National Academy for Educational Management Journal, vol. 8, no. 16, pp.145-152